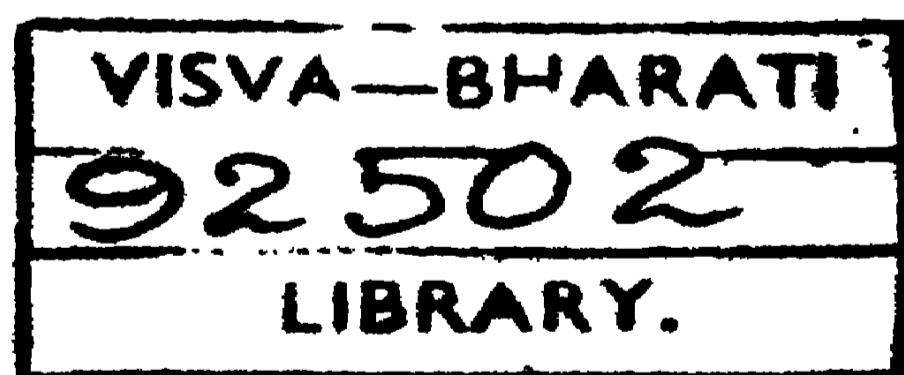
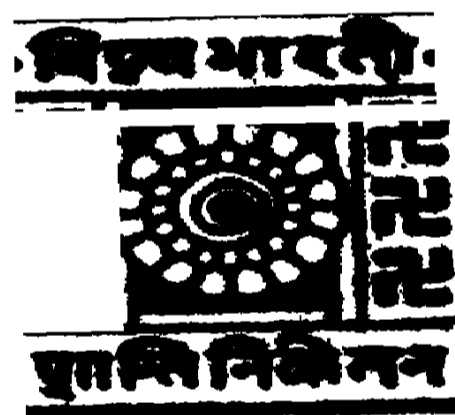


ସଂସ୍କୃତ-ସଂଗ୍ରହ

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ঐচ্ছিক



বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৪
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৮৮০ শক : জুলাই ১৯৫৮

মূল্য ২১, ১২, ও ১৩,

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী । ৬৩ বারকানাথ ঠাকুর সেন । কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যারণন বহু
শান্তিনিকেতন প্রেস । শান্তিনিকেতন । বীরভূম

সূচী

	নং
চিত্রসূচী	
কবিতা ও গান	
এহাসিনী	১
সংবোধন	৩৩
আকাশপ্রদীপ	৭১
নাটক ও প্রহসন	
চণ্ডালিকা	১৩১
ভাসের দেশ	১৫৫
উপন্যাস ও গল্প	
গল্পগুচ্ছ	১৩৭
প্রবন্ধ	
সাহিত্যের পথে	৩৫৩
পরিশিষ্ট	৪৬৫
গ্রন্থপরিচয়	৫২৩
বর্ণামুক্যিক সূচী	৫৫৩

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

ভাসের দেশের অভিনয়

৩
১৬৯

কবিতা ও গান

ପ୍ରହାସିନୀ

ধুমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটার
ছালোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ঘুরিতে পারায়ে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে স্তদূরে হারায়ে,
সৌর বিদ্যুৎক পায় ছুটি ।

আমার জীবনকক্ষে আনি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খাপা ধুমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় খেলি,
কণতরে কৌতুকের ছেনেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি ।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্ অবকাশে
কখনো বা মুহূর্ণিত কতু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে বলকে—
তারি কেহ ক্রম নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে ।

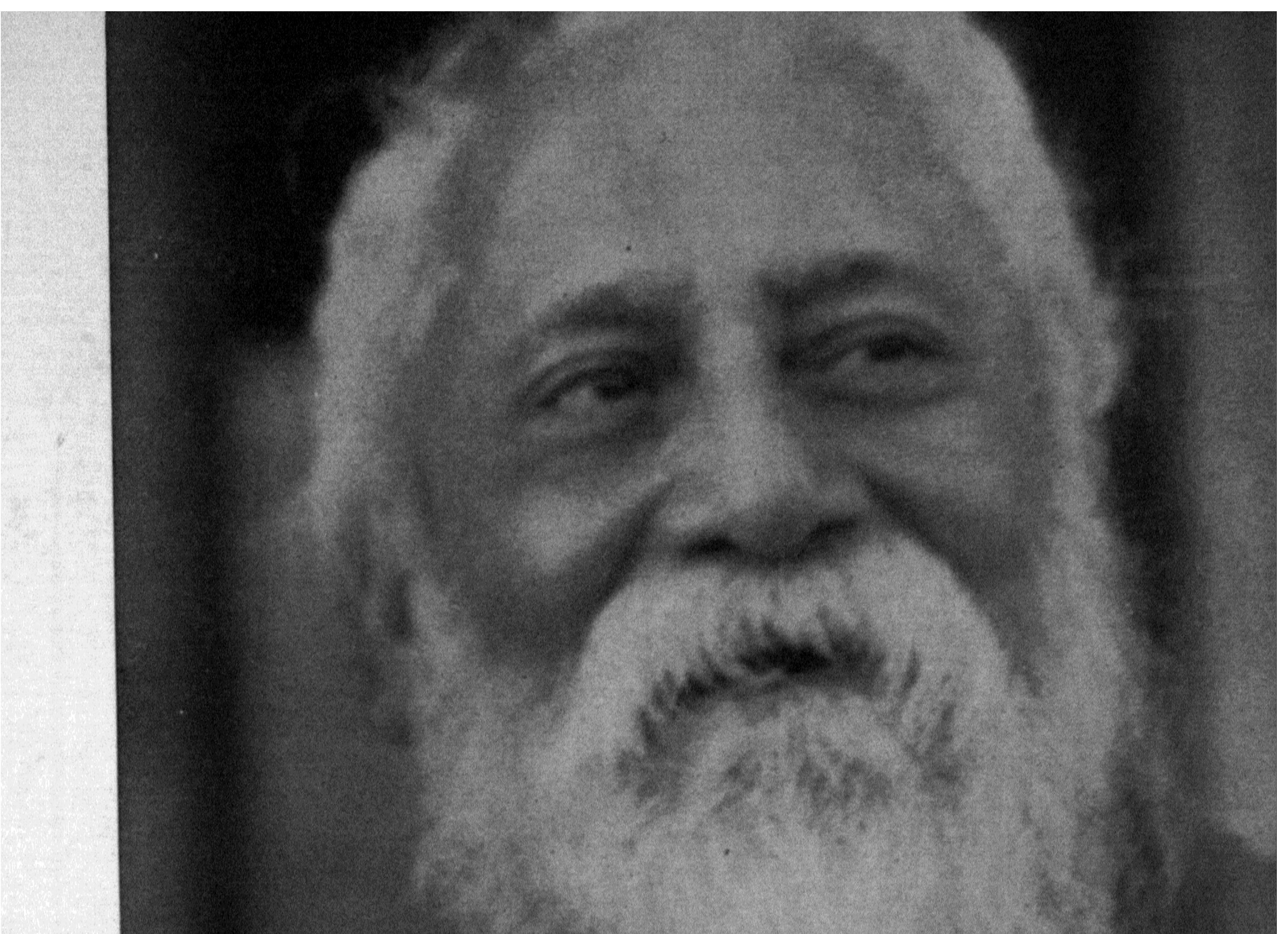
তিমির-আগনে যবে ধ্যানমগ্ন রাস্তি
উদ্বাবিধনকর্তা করে মাতামাতি—
হুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে ।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে,
 বিধাতার স্নেহ তাহে মহাস্ত দৃষ্টিতে ।
 তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
 রয়েছে খচিত হয়ে আমার সন্মানে—
 মূল্য তার মনে মনে জানি ।

এত বুড়ে কোনোকালে হব নাকো আমি
 হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্লামি ।
 এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
 বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
 হাসিতে হাসিতে লব মানি

শ্রাবলী । শান্তিনিকেতন
 পৌষ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



প্রহাসিনী

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই যোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সস্তাপ তাই যোর ।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বস্তার
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্তর
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অভিনয়,
চূপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয় ।
বলিব ছ-চার কথা, ভালো মনে শুনো ডা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা ।
পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্র
আমি তো উদমুসারে পেরিয়েছি সত্তর ।
আয়ুর ভবিল যোর কৃষ্টির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে ।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হৃদয়
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম ।
তবু যোর নাম আজো পারিবে না ঠাণ্ডে
প্রাচীনিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে ।
জীর্ণ জীবনে আর রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জগ্নেছি অধুনাই ।
সাড়ে আঠারো শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয় ;
যোর ষারা মেয়ে-বোন নারদের পিসি নয় ।
আধুনিকা ষারে বল তাহে আমি চিনি যে,
কবিশ্যে তারি কাছে ষারো আনা কণী যে ।

তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
 পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি ।
 প্রশাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
 রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর ।
 কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
 সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে ।
 মনোলোকে দৃষ্টী যারা মাধুরীনিবন্ধে
 গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ যে ।
 সেকালেও কালিদাস-বরকচি-আদিরা
 পুরস্কন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
 যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
 তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে ।
 আধুনিক ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
 তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যাম্বুশীলনা ।
 পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সূত্রহ,
 চিরকাল তাই তারে এত মহাসূত্রহ ।
 জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্নিপারে বা নূপুরে
 নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে ছপুরে,
 যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
 প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে ।
 তবু কবি-রচনার যদি কোনো ললনা
 দেখ অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা ।
 মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
 ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি ।
 মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্টা যে মিথ্যে
 সে কথাটা চাপা থাকে কবির সাহিত্যে ।
 ঐ দেখো, ওটা বুঝি হল স্নেহবাক্য ।
 এরকম বাক্য কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য ।
 প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
 সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা ।

বারে বারে এইমতো করি অত্যাঙ্কি
কমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি ।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের ঘরে মোরা ভিকার খলি বই ।
অর ভয়িয়া দাও স্বধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে ।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অস্তত কান দিয়ে ।
পুরুষ পুরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা ।
করণায় ব'লে থাক, “আহা, মন্দ বা কী ।”
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-কাঁকি ।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কখনা,
এও লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা ।
এর পর বাশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে তুলো পার যদি ভুলিতে ।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে
তাংলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া ।

এ কী গেরো । কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেটিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে ।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি ।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই ;
এস্টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অতএব, মন, তোমার কলসি ও দড়ি আন,
 অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান ।
 কোনো ফল ফলিবে না আখিজল-সিচনে ;
 শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে ।
 গদগদ স্বর কেন বিনায়ের পাঠটার,
 শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায় ।

তোমাদের মুখে থাক্ হান্তের যোশনাই—
 কিছু সীরিয়াম কথা বলি তবু, দোষ নাই ।
 কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
 শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী ।
 এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্ফেশানেই
 তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই ।
 জীবনের সঙ্কায় তাহাদেরি বরণে
 শেষ রবিবেশা হবে সোনা-আঁকা স্বরণে ।
 স্বর-স্বরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
 মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
 এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
 কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না ।
 আমাদের কত ক্রটি আসনে ও শয়নে,
 কমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে ।
 প্রেমদীপ জ্বলেছিল পুণ্যের আলোকে,
 মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে ।
 নানারূপে ভোগস্বধা যা করেছে বরষন
 তারে শুচি করেছিল স্বকুমার পরশন ।
 দামি বাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
 মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে ।
 তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
 তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথের ।

আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আত্র সে কালটা সিনিকাল !
কিছু আছে যার লাগি স্নগভীর নিশ্বাস
জ্বগে ওঠে— ঢাকা থাক তার প্রতি বিশ্বাস ।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই ।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ে না চেতনা,
ছায়াবে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না ।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার ।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের—
কবি-পরে তার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের ।
“তুলিব না, তুলিব না” এই বলে চৌংকার
বিধি না শোনেন কহু, বলা তাহে হিত কার ।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভোলো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে ।
ভুৎ উৎস খুঁজে মক্কাটি খোঁড়াটা,
ভেলহীন দীপ লাগি দেশলাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এবে কয় জনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সহুপায় এ নহে ।
মনে জনো জীবনটা মরণেরই স্বভাব—
স্বায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিকি না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে

ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি বাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে

লাহোর

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

নারীপ্রগতি

শুনেছিছ নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে—
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি স্মিনিল এ বাসি ।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে ;
কেনে নি ইস্টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট ;
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;—
তারো তো মন্দ-মধুর দোলায়
শাস্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে ।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি ;

পুরুষেরে দিল ছুঁদায় ভাড়া,
 ছুঁবার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া । —
 ভুকম্পনের বিগ্রহবতী
 প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
 বহন করিয়া এসেছে বন্ধে
 পাছুকামুখর চরণভঙ্গে ।

সে ধনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
 কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
 উষ্ণীষ তব ; ছুকছুক বুক
 ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে ।
 একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
 অকপটে তারি জবাব দেবার
 আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
 উত্তর পেলো রাখিব গোপনে—
 স্মিৎস্মায়া ছিলে যে অতীতে
 তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
 নিতে চাও কতু তীব্রভাষণ
 আধুনিকাদের কবির আসন ?
 মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যাৎ-দূত
 লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত ।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' হুড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—

চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।

বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—

তাহার অধিক মিঠে, কল্যা, কোমল হাতের চাপড়ি ।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্নু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
 চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
 তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি ।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্নু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
 চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুস্ক-
 তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উস্ক ।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্নু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
 চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোয় তলা—
 তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা ।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্নু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
 চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
 তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না ।

পরিণয়মঞ্জল

তোমাদের বিয়ে হল কাপ্তানের চৌঠা,
 অক্ষয় হয়ে থাক সিঁড়রের কোটা ।
 সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
 নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে ;
 শাণ্ডি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা' ।

'পাক প্রণালী'র মতে কোরো 'তুমি বন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেবা বন্ধন ।

চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা ;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে কন্দন ।

বা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক ।

বন্ধুরা খার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি—
ত্রিহুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন ছুখ ।

বই-কেনা শখটারে দিয়ে নাকো প্রশয় ;
খার নিয়ে ফিরিয়ে না, তাতে নাহি দোষ রয় ।

বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ে মন্থসংহিতাটি :
'স্বী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হৌশ রয় ।

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভংসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মংসে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে ছুজনে শুধু বসিবে কি ছ'তলায় ।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বংসে ।

ক্রত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক্ ইষ্ট ।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে বে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে ;
তার পরে আরো কী বা যবে অবশিষ্ট ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
 সাতভাই চম্পার
 পথ চেয়ে বসেছিল
 দৈবানুকম্পার ।
 মনে মনে বিধি-মনে
 করেছিল মন্ত্রণ,
 যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
 পায় সে নিমন্ত্রণ ।
 যদি জ্বোটে দরদি
 ছোটো-দি বা বড়ো-দি
 অথবা মধুরা কেউ
 নাতনির র্যাঙ্কে,
 উঠিবে আনন্দিয়া,
 দেহ প্রাণ মন দিয়া
 ভাগ্যেরে বন্দিবে
 সাধুবাদে খ্যাঙ্কে ।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
 ভাই গেল জিতিয়া
 ধরিল পারুল দিদি
 হাতা বেড়ি খুন্সি ।
 নিরামিষে আমিষে
 রেঁধে গেল ঘামি সে,
 বুড়ি ভ'রে জমা হল
 ভোজ্য অগুন্সি ।
 বড়ো খালা কাংসের
 মংস ও মাংসের
 কানায় কানায় বোঝা

হয়ে গেল পূর্ণ ।
সুখাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল ষোভে
লোগে গেল ঘূর্ণো ।
জমে গেল জনতা,
মহা তার জনতা
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী ।
নিদাক্ষণ সংশয়
মনটারে দংশয়—
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি ।
চোখ বেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, “দ্বিদি মোর !”
কেহ বলে, “বোন গো,
দেখেতে না থাক্ ধন,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ে স্বরণ গো ।”
দ্বিদিটির হান্স
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ ।
ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনার ব’সে
করিলাম ভঙ্গণ ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

লিখেছিহু কবিতা
 সুরে তালে শোভিতা—
 এই দেশ সেরা দেশ
 বাঁচতে ও মরতে ।
 ভেবেছিহু তখুনি,
 একি মিছে বকুনি ।
 আজ তার মর্মটা
 পেরেছি যে ধরতে ।
 যদি জন্মাসুরে
 এই দেশেই টান ধরে
 ভাইরূপে আর বার
 আনে যেন দৈব—
 হাঁড়ি হাঁড়ি রক্তন,
 ঘষাঘষি চন্দন,
 ভগ্নী হবার দায়
 নৈবচ নৈব ।
 আসি যদি ভাই হয়ে
 যা রয়েছি তাই হয়ে
 মোরগোল পড়ে যাবে
 হলু আর শঙ্খ—
 জুটে যাবে বুড়িরা
 পিসি মাসি খুড়িরা,
 ধুতি আর সন্দেশ
 দেবে লোকজনকে ।
 বোনটার ধ'বে চুল
 টেনে তার দেব ছল,
 খেলার পুতুল তার
 পায়ে দেব দলিয়া ।
 শোক তার কে থামায়,
 চুমো দেবে মা আমায়,

রাঙ্গুসি বলে তার
 কান দেবে মালয়া ।
 বড়ো হলে নেব তার
 পদখানি দেবতার,
 দাদা নাম বলতেই
 আধি হবে সিক্ত ।
 ভাইটি অমূল্য,
 নাই তার তুলা,
 সংসারে বোনটি
 নেহাত অতিরিক্ত ।

ভাইবিতায়া, ১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'বে ভোজনরসভোগ,
 সাবধানতা সেটা যে মহারোগ ।
 যত্ন যদি বিকৃত হয়
 স্বীকৃত হবে, কিসের ভয়,
 নাহয় হবে পেটের গোলযোগ ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ভয়,
 দুখভোগের হারাম অবসর ।
 জীবন মিছে দীর্ঘ করা
 বিলম্বিত মরণে মরা
 শুধুই বাচা না ধেষে কীর সর ।

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশি,
 তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি ।
 আত্মা জানে রসের রুচি,
 কামনা করে কোফ্তা লুচি,
 তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,

মরণভীক, এ কথা বুঝিবি না ।

রোগে মরার ভাবনা নিয়ে

সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—

কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা ।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,

পেটের নাড়ি বাধায় টংকৃত ।

ওড়িকলোনে ললাট ভিন্দে,—

মাছুলি আর তাগা-তাবিন্দে

সারাটা দেহ হবে অলংকৃত ।

যখন আধিতৌতিকেব বাঞ্জিবে শেষ ঘড়ি,

গলায় যমদৌতিকেব দড়ি ।

হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ হবে,

কবিরাজি ও নারাজ হবে,

তখন আবধৌতিকেব বড়ি ।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে

অন্নশূলসাধনকৌতুকে ।

কাঁচা আমের আচার যত

রহিবে হয়ে বংশগত,

ধরাবে জালা পারিবারিক বুকে ।

থাওয়া বাঁচায় বাঙালিদের বাঁচিতে হলে কোঁক

এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক ।

অপরিপাকে মরণভয়

গৌড়জনে করেছে জয়,

তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক ।

লড়া আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,

গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত ।

আচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,

ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,

বৈষ্ণ ডাকো—তাহার পরে মৃত

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় ধারে ব'লে থাকে আমাশা
যত দূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা ।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো,
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো ।

বউমার অব্যবহিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে ।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চৰ্যা ও কত পেয় ;
ডেকে ডেকে বলেছেন, “যত পার তত খেয়ো ।”
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের—
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূমির ;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা,
অস্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা ।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতিনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, কতি নেই আমাদের ।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে ।
বিশ্বে ছড়াল খ্যাতি ; বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, “বলো দেখি, হল কী হে ।”
এত বড়ো রটনার কারণ ঘটান যিনি
তার কাছে কবি রবি চিরদিন যবে ঋণী ॥

গরঠিকানি

বেঠিকানা তব
 আলাপ শব্দভেদী
 দিল এ বিজনে
 আমার মৌন ছেদি ।
 দাহুর পদবী
 পেয়েছি, তাহার দায়
 কোনো ছতো করে
 কভু কি ঠেকানো যায় !
 স্পর্ধা করিয়া
 ছন্দে লিখেছ চিঠি ;
 ছন্দেই তার
 জবাবটা থাক মিটি ।
 নিশ্চিত তুমি
 জানিতে মনের মধ্যে,—
 গর্ব আমার
 খর্ব হবে না গণ্ডে ।
 লেখনীটা তুল
 শব্দ জ্ঞাতেরই ঘোড়া ;
 বয়সের দোষে
 কিছু তো হয়েছে খোঁড়া ।
 তোমাদের কাছে
 সেই লজ্জাটা ঢেকে
 মনে সাধ, যেন
 যেতে পারি মান রেখে ।
 তোমার কলম
 চলে যে হালকা চালে,
 আমারো কলম
 চালাব সে ঝাঁপতালে ;

হাঁপ ধরে, তবু
 এই সংকল্পটা
 টেনে রাখি, পাছে
 দাও বয়সের খোঁটা।
 ভিতরে ভিতরে
 তবু জাগ্রত রয়
 মর্পহরণ
 মধুসূদনের ভয়।
 বয়স হলেই
 বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
 বড়ো স্ত্রীণা মোর
 সেই অভাগার 'পরে।
 প্রাণ বেরোলেও
 তোমাদের কাছে তবু
 ভাই তো ক্রান্তি
 প্রকাশ করি নে করু।

কিন্তু একটা
 কথায় লেগেছে খোঁকা,
 কবি বলেই কি
 আমারে পেয়েছ বোকা।
 নানা উৎপাত
 করে বটে নানা লোকে,
 সহ্য তো করি
 পষ্ট দেখেছ চোখে,—
 সেই কারণেই
 তুমি থাক দূরে দূরে,
 বলেছ সে কথা
 অতি সঙ্করণ সুরে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বেশ জানি, তুমি
 জান এটা নিশ্চয়—
 উৎপাত সে যে
 নানা রকমের হয় ।
 কবিদের 'পরে
 দয়া করেছেন বিধি—
 মিষ্টি মুখের
 উৎপাত আনে দিদি ।
 চাটু বচনের
 মিষ্টি রচন জানে ;
 কীরে সরে কেউ
 মিষ্টি বানিয়ে আনে ।
 কোকিলকণ্ঠে
 কেউ বা কলহ করে ;
 কেউ বা ভোলায়
 গানের তানের স্বরে ।
 তাই ভাবি, বিধি
 যদি দরদের ভুলে
 এ উৎপাতের
 বরাদ্দ দেন তুলে,
 শুকনো প্রাণটা
 মহা উৎপাত হবে ।
 উপমা লাগিয়ে
 কথাটা বোঝাই তবে ।—
 সামনে দেগো-না
 পাহাড়, সাবল ঠুকে
 ইলেক্টি কেবর
 খোঁটা পোতে তার বুকে ;
 সন্ধ্যাবেলার
 মন্থণ অন্ধকারে

এখানে সেখানে
 চোখে আলো খোঁচা মারে ।
 তা দেখে চাঁদের
 ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
 বার্তা পাঠায়
 শৈলশিখর-পানে—
 বলে, “আজ হতে
 জ্যোৎস্নার উৎপাতে
 আলোর আঘাত
 লাগাব না আর রাতে”—
 ভেবে দেখো, তবে
 কথাটা কি হবে ভালো ।
 তাপের জলন
 আনে কি সবারই আলো ।

এখানেই চিঠি
 শেষ ক’রে যাই চলে—
 ভেবো না যে তাহা
 শক্তি কমেছে ব’লে ;
 বুদ্ধি বেড়েছে
 তাহারই প্রমাণ এটা ;
 বুঝেছি, বেদম
 বাণীর হাতুড়ি পেটা
 কথারে চওড়া
 করে বকুনির জোরে,
 তেমনি যে তাকে
 দেয় চ্যাপটাও ক’রে ।
 বেশি যাহা তাই
 কম, এ কথাটা যানি—

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চৈচিয়ে বলার

চেরে ভালো কানাকানি ।

বাঙালি এ কথা

জানে না বলেই ঠকে ;

দাম যায় আর

দম যায় ষত বকে ।

চেষ্টানির চোটে

তাই বাংলার হাওয়া

রাতদিন যেন

হিস্টিরিয়ায় পাওয়া ।

তারে বলে আর্ট

না-বলা যাহার কথা ;

ঢাকা খুলে বলা

সে কেবল বাচালতা ।

এই তো দেখো-না

নাম-ঢাকা তব নাম ;

নামজাদা খ্যাতি

ছাপিয়ে যে ওর দাম

এই দেখো দেখি,

ভারতীর ছল কী এ ।

বকা ভালো নয়,

এ কথা বোঝাতে গিয়ে

খাতাখানা জুড়ে

বকুনি যা হল জমা

আর্টের দেবী

করিবে কি তারে কমা

সত্য কথাটা

উচিত কবুল করা—

সব যে উঠেছে
 রবিরে ধরেছে জরা,
 তারই প্রতিবাদ
 করি এই তাল ঠুকে ;
 তাই বঁকে যাই
 যত কথা আসে মুখে ।
 এ যেন কলপ
 চূলে লাগাবার কাজ—
 ভিতরেতে পাকা,
 বাহিরে কাঁচার সাজ ।
 কৌণ কঠেতে
 জোর দিয়ে তাই দেখাই,
 বকবে কি শুধু
 নাতনিজনেরা একাই ।
 মানব না হার
 কোনো মুখরার কাছে,
 সেই গুমোরের
 আঁজো ঢের বাকি আছে ।

কালিম্পং

৫ আষাঢ়, ১৩৩৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
 অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি বে
 মৌন মনের মধ্যে
 গঞ্জে কিংবা পঞ্জে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
 ফুল উঠিত ভ্রুগে—
 কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
 নিত্যই দেয় নাড়া,
 ধাক্কা খেয়ে যে জিনিমটা ফোটে খাতার পাতে
 তুলনা কি হয় কতু তার অশোকফুলের সাথে ।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
 গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
 শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে ।
 ফিকে রঙের নীল আকাশে
 আতপ্ত সমীরে
 আমার ভাবের বাষ্প উঠে
 ভেসে বেড়ায় ধীরে,
 মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
 নাই কোনো তার রূপ—
 মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
 মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
 শব্দনেগুচ্ছ-সাথে ।

এদিকে যে লেখনী মোর
 একলা বিবাহিণী ;
 দৈবে যদি কবি হতেন তিনি,
 বিরহ তাঁর পক্ষে বানিয়ে
 নিচের লেখার হাঁদে আমায়
 দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্কুলিচম্পান্ন,
 নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশ

যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
 অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে ।
 বন্ধ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
 কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান ।
 স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন ।
 করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ ।
 কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
 অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে ।
 পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা,
 দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা ।
 নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
 নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার তরে ।
 চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
 আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা ।
 ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
 গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে ।
 কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামি,
 আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি ।
 কাগজ নিত্য শুয়ে কাটার টেবিল-'পরে লুটি,
 বা দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি ।
 কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম—
 আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম ।
 অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
 আসবে তখন আবর্জনার বিসর্জনের দিন ।
 বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
 এ পত্র তার অমুকরণ ; আমায় তুমি ক্রমো ।
 নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি ।
 —তোমার কালিদাসী ।

পলাতক

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,

একজামিনেশনের ভাড়া ।

কেতাবের 'পরে খুঁকে থাক,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,

দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া

আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,

স্বমুখে নফর বনমালী ।

'স্বমুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় ঝিঁচে,

বিনাদোষে দিই তারে গালি ।

ভোজন ওজনে অতি কম—
নাই রুটি, নাই আলুদম,

নাই কুইমাছের কালিয়া ।

জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
ছ-পেয়লা Chinese tea-রে

আধসের ছুফ ঢালিয়া ।

উদাস হৃদয়ে খাট একা
টিনের মাখন দিয়ে সেকা

রুটি-তোস্ শুধু খান তিন ।

গোটা-ছই কলা খাই শুনে,
ভারই সাথে বিলিতি-বেগুনে

কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন ।

মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই ছ চারিটে

খেজুরগুড়ের সাথে মেখে ।

পরিচে পেরাকি হবে আনে
আড়চোখে চেঁসে তার পানে

‘পরে খাব’ বলে দিই রেখে ।

তারপর ছপুর অবধি

না কীর, না ছানা সর দধি,

ছুই নেকো কোফতা কাবাব ।

নিজের এ দশা ভেবে ভেবে

বুক যায় সাত হাত নেবে,

কারে বা জানাই মনোভাব ।

করছি নে exaggerate—

কিছু আছে সত্য নিরেট,

কবিত্ব সেও অল্প না ।

বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে

সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে

পনেরো আনাই কল্পনা ।

অতএব এই চিঠি-পাঠে

পরান তোমার যদি ফাটে

খুব বেশি হবে না প্রমাণ ।

চিঠির জবাব দেবে হবে

ভাষা ভরে দিয়ো হাহারবে

কবি-নাতনির রেখো মান ।

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়

যদি কোনো নীতিবাদী কয়

কোস্ তাহে, “অতিরিক্ত উক্তি—

মসলার যোগে যথা রান্না,

আবদারে চল ক’রে কান্না,

নাকিসুর-যোগে যথা সুক্তি ।

কুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
 চোরেও চায় না কোনোকালে,
 কানে কুমকোর ফুল দামি ।
 কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
 কৃত্রিম উপাধিতে নাম,
 জমকালো করেছি তো আমি
 অতএব মনে রেখো দড়ো,
 এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
 যে-হেতুক বাড়িয়ে বলায়
 বাজারে তুলনা এর নেই—
 কেবলই বানানো বচনেই
 ভরা এ যে ছলায় কলায় ।
 পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
 সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
 তবুও বলিস প্রাণপণ
 বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা—
 ভুলিবে, হবে না অশ্রুতা,
 দাদামশায়ের বোকা মন ।
 যা হোক, এ কথা চাই শোনা,
 তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
 না হয় না হলে কবির—
 অশ্রুকের শরাস্ত
 আছি আমি ভীষ্মের মতো,
 তাহে তুমি বাড়িয়ে না স্বর ।
 যে ভাষায় কথা কয়ে থাক
 আদর্শ তারে বলে নাকো,
 আমার পক্ষে সে তো ঢের—
 flatter করিতে যদি পার
 গ্রাম্যতানোষ যত তারো
 একটু পাব না আমি টের ।

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিস্ত,—

কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ে তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে,
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুন্ডশ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু,
গণ্ডদেশে পাবেন স্করের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাশ্তি ।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয় ।
কৃষ্ণসার সে বদধেম্মালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারনি মইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে ।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনি
বলেন না তো 'দ্বিধা হও, মা ধরনী' ।

গোড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি ।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা

রবীন্দ্র-রচনাবলী

লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
“দাতা বটে ষোলো আনা।”

বিপুল ভোজনে মনের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
খুঁজিয়া না পাবে চাবি—
পাওনা-ঘাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবি।

রুকু ছয়ার বহুমান তার
ধারীর প্রসাদে খোলে।

মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সামনে আসিয়া নত্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গোড়।

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা ষত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু নত্যা এ কথা—
বারো আনা অভদ্রতা

কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক' তারে,
ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চূকে ।

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা ।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে ।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয় ।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম
সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজ্জকারের কাছে ।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ—
তা নিয়ে কান না ভেউ-ভেউ ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছি,
নামের আদর নাহি যাচি ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগি ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোকর ।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা ।
লজ্জসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য ।
তাই তো নিজেই বলি, দিক্,
তোমারই হিসাব-জ্ঞান ঠিক ।

বস্তু-অবস্তুর সেঙ্গ্
 খাটি তব, তার ডিকারেঙ্গ্
 পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
 তাই, হে লজ্জুস-লুভি,
 মতলব করি মনে মনে,
 খাতা থাক্ টেবিলের কোণে ।
 বনমালী কো-অপেতে গেলে
 টফি-চকোলেট যদি মেলে
 কোনোমতে তবে অস্তুত
 মান রবে আঙ্গকের মতো ।
 ছ বছর পরে নিয়ো খাতা,
 পোকায় না কাটে যদি পাতা ।

শাস্তিনিকেতন
 ১ পৌষ, ১৩৪৫

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পা জ্বালা,—
 লেগেছি প্রফ-করেক্শনে গলায় কুন্দমালা ।
 ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজ্ঞান ঘরে একা,
 এমন সময় নাতনি দিলেন দেখা ।

সোনার কাঠির শিহরলাগা বিশ্বছরের বেগে
 আছেন কণ্ঠা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে ।
 হঠাৎ পাশে আসি
 কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
 বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
 “কোন্ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে ।”
 একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিঘে চোখ
 বলে দিলেম, “যেই বা সে-জন হোক
 বলব না তার নাম—
 কী জানি, তাই, কী হয় পরিণাম ।

মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
 একটুতে বুক জ্বালায়।”

বললে শুনে বিংশতিকা, “এই ছিল মোর ভালে—
 বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
 কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
 মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।”

আমি বললেম “কেনই বা দাও লাজ,
 করোই-না আন্দাজ।”

বলে উঠল, “জানি, জানি, ঐ আমাদের ছবি,
 আমারই বাছবী।
 একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্ল-স্কুলে,
 তোমার নামে চোখ পড়ে তার চুলে।
 তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
 মুগ্ধ আঁধি পক্ষপাতের কটাক্ষ সজ্জানে।”

আমি বললেম, “নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
 আমাদের ঐ জগা মালী, মুহূর্ত্তে কই।”

নাতান বলে, “হায় কী দুঃবস্থা,
 বয়স হয়ে গেছে ব’লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
 যে গলাটার আমরা গলগ্রহ
 জগামালীর মালা দেখায় কোন্ লজ্জায় বহ।”

আমি বললেম, “সত্য কথাই বলি,
 তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।
 নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
 ঐ যে কঠিন কালো।
 জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
 বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
 তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
 বস কিছু তার পাই যে অসুভবে।
 এ-সব কথা বলতে মানি শুয়
 তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এ বাণী বস্তুত
 কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছতো,
 ডাইডাক্টিক আখ্যা দিয়ে ধারে
 নিন্দা করে নতুন অলংকারে ।
 গা ছুঁয়ে তোর কই,
 কবিই আমি, উপদেষ্টা নই ।
 বলি-পড়া বাকল ওয়ালা বিদেশী ঐ গাছে
 গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
 আকাবাকা ডালের ডগা ধূসর রঙে চেয়ে—
 যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
 দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
 ব্যঙ্গকুটিল ছুঁবাক্য-চয়নী,
 ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
 হরিজনের প্রপাগ্যাণ্ডা দিচ্ছে বুঝি উকি ।
 এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
 অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে
 সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
 আজকে যদি বলি ‘আমার প্রাণ
 জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাটি’,
 তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি ।’
 নাতনি কহেন, “ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
 আমার মনে সত্যি লাগায় বাথা ।
 তোমার বয়স চারিদিকের বয়সখানা হতে
 চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে ।
 একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাতি,
 নাইকো তোমার আপন দরের সাধি ।
 জগামালীর মালাটা তাই আনে
 বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে ।’
 আমি বললেম, “দয়াময়ী, ঐটে তোমার তুল,
 ঐ কথাটার নাইকো কোনো মূল ।

আন তুমি, ঐ যে কালো মোষ
আমার হাতে কুটি খেয়ে যেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় বলে সে আছে কি তার দোষ ।

জগামালীর প্রাণে

যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে

কী নাম দেব তার,

একরকমের সেও অভিসার ।

কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,

সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয় ।”

নাতনি হেসে বলে,

“কাব্যকথার ছলে

পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার খলি,

ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি ।”

আমি বললেম, “যদি কোনোক্রমে

অন্নগ্রহের ভ্রমে

ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,

হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে ।”

নাতনি বলে, “সত্যি বলো দেখি,

আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি ।”

আমি বললেম, “নিশ্চয় লিখবই,

আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য্য করেই কই ।

বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভূক,

শোনো তবে, এইমতো তার শুরু ।—

‘শুরু একাদশীর রাতে

কলিকাতার ছাতে

জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,

গলায় আমার কন্দমালা গোলাপজলে ধোঁওয়া’—

এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প’ল,

এটা নেহাত অসাময়িক হল ।

হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,

একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা ।

শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
 সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা ।
 তাছাড়া ঐ পারিজাতের স্তাকামিও ত্যাজ্য,
 মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায় ।
 বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
 ‘আকাশ সে দন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
 রাতটা যেন কুলিমাগি কমলাখনি থেকে
 এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে ।’
 তার পরেকার বর্ণনা এই—‘তামাক-সাজ্জার ধনে
 জগার খ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
 দিনরাত্রি ল্যাপা ।
 তাই সে জগা খ্যাপা
 যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
 তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ ।’ ”
 নাতনি বললে বাধা দিয়ে, “আমি জানি জানি,
 কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অহুমানি ।
 যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
 সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায় ।
 বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
 ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য ।”
 আমি বললেম, “ওগো কণ্ঠে, গলদ আছে মূলেই,
 এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই ।
 মালাটাই যে ঘোর সেকলে, সরস্বতীর গলে
 আর কি ওটা চলে ।
 রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
 সেটা গলায় দড়ি ।”
 নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
 এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে ।

সংযোজন

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র

কলকস্তামে চলা গয়োর সুরেনবাবু^১ মেয়া,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো মেয়া ।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্চা—
মহিনা-ভবু কুছ খবর মিলে না ইখে তো নহি আচ্চা ।
টপালু,^২ টপালু, কঁহা টপালুবে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপালুকো নাম গন্ধ !
ঘরকো ষাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে কবুখং ।
লো-চার কলম লীখ্‌ দেওদে ইস্‌মে কা হর হরুকং !
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্‌ বৈঠকে আছি একলা—
সুরিবাবাকো বাস্তে আখ্‌সে বহং পানি নেকলা ।
সর্বদা মন কেমন কবুতা, কেঁদে উঠতা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল ষাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মনকা দুঃখে হুহ কবুকে নিকলে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাজলাকো জবানী ।
মেয়া উপর জুলুম কবুতা তেরি বহিন বাই,^৩
কী করেজা কোখায় ষাক্য ভেবে নাহি পাই !
বহং জোরসে গাল টিপতা দোনো আক্‌লি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজনা বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোটেমে চিম্‌টি কাটতা,
কাচি লে কর কোকড়া কোকড়া চুলগুলো সব ছাটতা,
জজসাহেব^৪ কুছ বোলতা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরবে কঁহা গয়োরবে জজসাহেবকি বেটা !

১ সুরেননাথ ঠাকুর ।

২ চিঠির ডাক ।

৩ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ।

৪ অগ্রজ সত্যেননাথ ঠাকুর, সুরেননাথের পিতা ।

গাড়ি চড়কে লাঠিন পড়কে তুমি তো যাতা ইন্ডিন,
 ঠোটে নাকে চিম্টি থাকে হমারা বহৎ মুন্ডিল !
 এদিকে আবার party হোতা খেলনেকোবি যাতা,
 স্মিখানায়ে হিম্বিম্বি এবং খোড়া বিস্কুট খাতা ।
 তুমি ছাড়া কোই সম্ভে না তো হমরা দুরাবস্থা,
 বহিন তেরি বহৎ merry খিলখিল কর্কে হান্তা !
 চিঠি লিখিও মাকে দিও বহৎ বহৎ সেলাম,
 আজকের মত তবু বাবা বিদায় হোকে গেলাম ।

পত্র

দৃষ্টি-প্রলয়ের তবু

লয়ে সদা আছ মত,
 দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে ;
 গ্রহভারকার পথে
 বাইতেছ মনোরথে,
 ছুটিছ উড়ার পিছে পিছে ;
 হাঁকায়ে ছ-চারিছোড়া
 তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া
 কলপনা গগনভেদিনী
 তোমারে করিয়া সঙ্গী
 দেশকাল যায় লজ্জি,
 কোথা প'ড়ে থাকে এ যেদিনী ।
 সেই তুমি ব্যোমচারী
 আকাশ-রবিরে ছাড়ি
 ধরার রবিরে কর মনে—
 ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
 একি আজ অমুগ্রহ
 জ্যোতির্হীন মর্ত্যবাসী জন ।

ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ,
 দূরবীন ভ্রষ্টলক্ষ্য,
 কোথা হতে কোথায় পতন ।
 ত্যজি দীপ্ত ছায়াপথে
 পড়িয়াছ কায়াপথে—
 মেদ-মাংস মজ্জা-নিকেশন ।

বিধি বড়ো অক্ষুণ্ণ,
 মাঝে মাঝে হয় ভুল,
 ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
 তবু তো কপেকতরে
 ধূলিময় খেলাঘরে
 মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে ।
 তুমি অল্প কান্দীবাসী,
 সম্প্রতি লয়েছ আসি
 বাবা ভোলানাথের শরণ ;
 দিব্য নেশা জন্মে ওঠে,
 দু বেলা প্রসাদ জ্বাটে,
 বিধিমতে ধূমোপকরণ ।
 জেগে উঠে মহানন্দ
 ধূলে যায় ছন্দোবদ্ধ,
 ছুটে যায় পেল্লিল উদ্দাম—
 পরিপূর্ণ ভাবভরে
 লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
 বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম ।
 আমার সে কর্ম নাস্তি,
 দারুণ দৈবের শাস্তি,
 স্নেহা-দেবী চেপেছেন বন্ধে—

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সহজেই দম কম
 তাহে লাগাইলে দম
 কিছুতে যবে না আর রক্ষে ।
 নাহি গান, নাহি বাণি,
 দিনরাত্রি শুধু কাণি,
 ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
 নবরস কবিত্বের
 চিত্তে ছিল জমা ঢের,
 বহে গেল সর্দির প্রবাহে ।
 অতএব নমোনম,
 অধম অক্ষমে কম,
 ভঙ্গ আমি দিহু ছন্দরগে—
 মগধে কলিঙ্গে গোড়ে
 কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
 কে বলা পারিবে তোমা-সনে

বনক্লেত্র, শিমলাশৈল
 শনিবার, ১৮৯৮

সুসীম চা-চক্র

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রথমতঃ উপলক্ষ্যে

হায় হায় হায়
 দিন চলি যায় ।
 চা-স্পৃহ চঞ্চল
 চাতকদল চল
 চল চল হে !
 টগবগ উচ্ছল
 কাথলিতল জল
 কল কল হে

এল চীন-গগন হতে
 পূর্বপবনশ্রোতে
 শ্রামল রসধরপুঞ্জ,
 শ্রাবণবাসরে
 রস ঝরঝর করে
 ভূঞ্জ হে ভূঞ্জ
 দলবল হে!

এস পুঁথিপরিচারক
 তদ্বিতকারক
 তারক ভূমি কাণ্ডারী,

এস গণিত-ধুরন্ধর
 কাব্য-পুরন্দর
 ভূবিবরণ ভাণ্ডারী।

এস বিশ্বভার-নত
 শুক-কটিনপথ
 মরুপরিচারণ ক্রান্ত!

এস হিসাব'পস্তর'ত্রস্ত
 তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
 লোচনপ্রান্ত
 ছল ছল হে!

এস গীতিবোধিচর
 তদ্বুরকরধর
 তানতালতলমগ্ন,

এস চিত্রী চটপট
 ফেলি ভুলিকপট
 রেখাবর্ণবিলগ্ন।

এস কনস্টিটুশন
 নিয়ম-বিভূষণ
 তর্কে অপরিশ্রান্ত,

এস কমিটি-পলাতক

বিধানঘাতক

এস দিগ্ভ্রাস্ত

টলমল হে ।

[শাস্তিনিকেতন

শ্রাবণ ১৩৩১]

চাতক

ত্রিযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শাস্তিনিকেতন চাঁচক্রে আহৃত
অতিথিগণের প্রতি

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর

তিব্বতীর শাস্ত্র গিরিশিবে !

তিয়াষিদল সহসা এত গাহসে করি ভর

কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে !

পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,

অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে ।

নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাণি,

গোড়পাদ-পাদপে নাহি রহে ।

অহুস্বরে ধহুঃশর-টংকারের সাড়া

শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে ।

শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,

পালি ভাষায় শাসায় ভীকুদেবে ।

চাঁরস ঘন শ্রাবণধারাপ্রাবন লোডাতুর

কলাসদনে চাতক ছিল এরা—

সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,

চকোর-নেশে বিধুরে কেন ঘেরা

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি ধানের সাথে
 পাতিয়ে আছেন সখা,
 আর যারা সব প্রজাপতির
 ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
 উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে
 মিলুন উভয় পক্ষ,
 রসনাতে রসিয়ে উঠুক
 নানারসের ভক্ষ্য ।
 সত্যযুগে দেবদেবীদের
 ডেকেছিলেন দক্ষ
 অনাহৃত পড়ল এসে
 মেলাই বক্ষ বক্ষ,
 আমরা সে তুল করব না তো,
 মোদের অন্নকক্ষ
 দুই পক্ষেই অপক্ষপাত
 দেবে ক্ষুধার মোক্ষ ।
 আয়ো যারা বীধন-ছাড়া
 কুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
 বিদায়কালে দেব তাঁদের
 আশিস লক্ষ লক্ষ—
 "তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
 ছুটুন কারাধাক্ষ ।"
 এর পরে আর মিল যেনে না
 ব র ল ব হ ক্স ।

নাতবউ

অস্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
 সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে ।
 লুকু কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
 মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে ।
 দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিভে
 প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
 সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে ।

সম্বতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি
 আনে নিশাচ্ছে, সেও নিতাস্ত মন্দ না ।
 এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
 মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা ।
 তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
 ধালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে
 মোদক-লোভিত মুখ নম্রম নন্দে সে ।

প্রভাতবেলায় নিরলা নীরব অঙ্গনে
 দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে ।
 দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,
 সাজি সাজাইছে গোলাপে জ্বায় চম্পাতে ।
 আরো সে করুণ তরুণ তরুর সংগীতে
 দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গীতে,
 স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের স্বন্দে সে ।

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
 মালতীজড়িত বন্ধিম বেণীভঙ্গিমা ?
 দ্রুত-অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত ?
 শুভ্র শাড়ির প্রাস্তধারার রঙ্গিমা ?

পরিহাসে মোর মুহূ হাসি তার লঙ্কিত ?
অথবা ডালিটি দাড়িয়ে আঙুরে সঙ্কিত ?
কিহা খালিটি খরে খরে ভরা সন্দেশে ?

দার্জিলিং

বিজয়া দ্বাদশী, ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাড়ির মধ্যে
তুধুই কেবল ছিল কি তার মিষ্টতা ।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা ।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অস্থরে ।
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মস্তুরে ।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অস্থে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেবতা পাঠান ভাগ্যবস্ত্রে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে
সে বর তাহার বহন করল ঘানের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই স্বকপেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
ছঃখ যদি দেয় তবুও ছঃখ নেই ।

হেন গুমর নেইকো আমার, স্ততির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেমালের ক্রুর কটাক্ষে
কখন বহু হানতে পার অত্যাশায়

স্বীকৃত-সচনাবলী

দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অয়ে
 ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
 নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্মে
 ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত ।
 আজ বাদে কাল আদর যত না হয় কমল,
 গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো
 জোয়ারবেলায় কানায় কানায় মে জল জমল
 ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো ।
 অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
 তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি ।
 রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
 যখন হবে চরম স্বাসের নিঃসৃতি ।

বলবে তুমি, 'বালাই ! কেন বকছ মিথ্যে,
 প্রাণ গেলেও যত্নে হবে অকুণ্ঠা ।'
 বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিন্তে,
 মিথ্যে খোঁটার খোঁচাই তবু আগুনটা ।
 অকল্যাণের কথা কিছু লিখলু অত্র,
 বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে ছুট্টি মি ।
 তদন্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
 বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে কুট্টি মি ।

১ জুন, ১৯৩৫

নামকরণ

দেয়ালের ঘেঁরে যারা
 গৃহকে করেছে কারা,
 যর হতে আঙিনা বিদেশ,

গুরুভাষা বাঁধা বুলি
 যাদের পরায় ঠুলি,
 যেনে চলে বার্থ নিদেশ,
 যাহা কিছু আজগুবি
 বিশ্বাস করে খুবই,
 সত্য যাদের কাছে হেয়ালি,
 সামান্য ছুতোনাতা
 সকলই পাথরে গাঁথা,
 তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি ।

আলো যার মিটমিটে,
 স্বভাবটা খিটখিটে,
 বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
 সব ছবি ভূষো মেজে
 কালো ক'রে নিজেকে যে
 মনে করে ওস্তাদ পোটো,
 বিধাতার অভিশাপে
 ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে
 স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
 থ্যাক্ থ্যাক্ করে মিছে,
 সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
 তারে নাম দিব থ্যাক্শেয়ালি ।

দিনখাটুনির শেষে
 বৈকালে ঘরে এসে
 আরাম-কেদারা যদি মেলে—
 গল্পটি মনগড়া,
 কিছু বা কবিতা পড়া,
 সময়টা যার হেসে খেলে—

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দিয়ে জুঁই বেল জবা
 সাজানো সুহৃদসভা,
 আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
 ঠিক সুরে তার বাধা,
 মূলতানে তান সাধা,
 নাম দিতে পারি তবে কেদারি ।

শাস্তিনিকেতন

৭ মার্চ, ১৯৩৯

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে ছয়ার থাকে বন্ধ,
 ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ ।
 ভিজ্জিটরুকে এগিয়ে আনে ; অটোগ্রাফের বহি
 দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি ।
 আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
 বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি ।
 পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
 এমন দৌড় মারেন তখন মিথো তাঁরে ডাকা ।
 ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতার থাকে পড়ি ;
 অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি ।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
 মস্ত মস্ত ঋষিমূনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
 ভাঙন কিন্তু আর্টিস্টিক ; কবিজনের চক্ষে
 লাগত ভালো, শোভন হত দেব-তাদিগের পক্ষে ।
 তপস্শাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
 নিফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা ।
 ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
 তখন ছিল ফুলের বাধন, এখন দড়িদড়ান

ধাক্কা মারেন সেক্রেটারি, নয় মেনকা-রস্তা—
 রিয়লিস্টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা ।
 ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা—
 সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা ।
 কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
 ইন্দ্রদেবের ঝাঁক মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ ।
 গইতে হবে সুলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
 কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূন্দ ।

রেলটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে
 জিভে আর দাঁতে
 লেগে গেল বিচারের ঘন্ড,
 কে ভালো কে মন্দ ।
 বিচারক বলে হেসে,
 দাতজোড়া কী সর্বনেশে
 যবে হয় দৈতো ।
 কিন্তু, সে সুধাময় লোকবিশেষে তো
 হাসিরশ্মিতে,
 যাহারে আদরে ডাকি 'অরি সূন্দিতে'
 পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে ।

জিহ্বায় রস খুব জমে,
 অথচ তাহার সংশ্রবে
 দেহখানা যবে
 আগাগোড়া উঠে জলি
 রস নয়, বিষ তারে বলি ।

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—
 বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রকাশে এক রূপ যার
ঘোমটার আর ।
তুলনার দাঁত আর ভিত্ত
সবই বেলেটিভ ।
হয়তো দেখিবে, সংসারে
দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো ।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই ।

ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কতু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যতপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি ।

শ্রামলী, শাস্তিনিকেতন

৩০।১২।৩৮ সকাল

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তত্ত্বমন্ত্র মিছে,
মজু-পরশরদের সাধা নাই টানে তারে পিছে ।
বুদ্ধি মেনে চলা তার যোগ ;
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, নাখে গোলযোগ
মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে ।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষরাতে আগে ;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিরে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা ;

মাজা-ঘষা শেষ করে আঙিনার ছোটে—
 খড়্‌ফড়ে অ্যান্ড মাছ কোটে
 দুই হাতে লাজামুড়ো আপটিয়ে ধ'রে
 স্ননিপুণ কবজির জোরে,
 ছাই পেতে ঝটির উপরে চেপে ব'সে,
 কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে ।
 কুটিকুটি বানায় ইচোড় ;
 চাকা চাকা করে খোড়,
 আঙুলে অড়ায় তার স্ততো ;
 মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত ;
 চালভারে
 বিশ্লেষণ করে ধরধারে ।
 বেগুন পটোল আলু ধও ধও হয় সে অশুষ্টি ।
 তারপরে হাতা বেড়ি খুঁস্তি ;
 তিন-চার দফা রান্না সে
 নানা ফরমাশে—
 আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা কুগির কোনোটো,
 সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটো বা মোট
 যবে পাবে ছুটি
 বেলা হবে আড়াইটা । বিভালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
 পান-দোস্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম ;
 ছেলেটা চেষ্টায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
 বলবে "বজ্জাত ভারি" ।
 তার পরে রাত্রে হবে কুটি আর বাসি ভরকারি ।

অনার্দীন ঠাকুরের

পানাপুকুরের

পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাক ।

গা ধুয়ে তাহারই এক ফাকে,

ঘড়া কাঁখে, গায়তে জড়ায়ে ভিজ়ে শাড়ি
 ঘন ঘন হাত নাড়ি
 ধস্‌ধস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
 রাম নাম জপি মনে মনে
 ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
 গোধুলির ছম্‌ছমে অঙ্ককারছায়ে ।
 সন্ধ্যাবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
 জপমালা ঘোরে হাতে ।

বউ তার চুলের জটায়
 চিক্‌নি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলক রটায়
 পাড়াপ্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনে সে পেয়ে
 হস্তদস্ত আসে ধেয়ে
 ও-পাড়ার বোসগিন্নি ; চোখা চোখা বচন বানায়ে
 স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে ।

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
 তিলক কাটিয়া নাকে
 উপস্থিত আচার্ঘি মশায়—
 গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
 আটক পড়েছে তার বিয়ে ;
 তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
 স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
 কর্তারে লুকিয়ে তারই ধরচের হল বন্দোবস্ত ।

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
 চাটুজ্যে মশা'র অনুমত—
 কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোজে,
 নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে ।

মেয়েরাও বই যদি নিতাস্তই পড়ে
 মন যেন একটু না নড়ে ।

নূতন বই কি চাই । নূতন পত্রিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায় তাকে প্রণাম করুক শুভদিনে ।

আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাসন্যাস কালচারের দড়া ।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা ; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর স্নেহতার ।
ধর্মকর্ম হল ছারখার ।
শীতলামায়ীয়ে করে হেলা ;
বসন্তের টিকা নের ; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গানানে পাপ নাশে'
তনিয়া মূর্খের মতো হাসে ।

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে ।
মন্দির বাড়ায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে ।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে ঘরে ডাক্তারের গাড়ি ।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি ।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই ।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে ।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে বেধা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা বন্দুত ।

ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডকা ।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা

বেম্পত্তিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা ।

মধুসঙ্কায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার ।
মধুর অভাব হবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দত্যাৎ' বাণী বলে কবিরাজে ।
দায়ের পড়ে তাই
লুচি-পাঁউকটিগুলো গুড় দিয়ে খাই ;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দত্যাৎ',
সে যেন গজের দেশে আসি পত্যাৎ ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিন্ত
নিখাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য ।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য ।
গোড়ী গজ হতে মধুময় পদ্ম
দর্শন দিতে পারে সজ্জ ।

তন্নাস করেছিহু, হেথাকার বৃক্ষের
চারিদিকে লক্ষণ মধু-তুভিক্ষের ।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি কীণ মধুভাণ্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে ।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে ।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিহু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার ।
মৌচাক-রচনার সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা ।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
জাস্তি না মেলে তবু খুশি রব খোড়াতেই ।
তাও কতু সম্ভব না হয় যদিশ্রাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দত্যাৎ ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
তুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয় ।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা ।
এইভাবে করা ভালো সম্ভাষণ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কতু তার নাহি নাশ রয় ।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

৩

মধুসং পার্শ্বিকঃ রসঃ

শ্রামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডবণী বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্নে পরাহ্নে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে ;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
 রসনার রসযোগে অস্তরে পশিবে তার কথা ।
 ভেবেছিহু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
 সন্নেহ আঘাত দেবে তোমাতে আমার পরিহাস ;
 তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
 তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি ।
 দেখিহু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে ;
 তোমাতে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে ।

৫ মার্চ, ১৯৪০

৪

দূর হতে কয় কবি,
 'জয় জয় মাংপবী,
 কমলাকানন তব না হউক শূন্য ।
 গিরিতটে সমতটে
 আচ্ছি তব যশ রটে,
 আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য ।
 তোমাদের বনময়
 অফুরান যেন রয়
 মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য ।
 কবি প্রাতরাশে তার
 না কক্ক মুখভার,
 নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ ।
 আরবার কয় কবি,
 'জয় জয় মাংপবী,
 টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য ।
 রুটি বলে জয়-জয়,
 লুচিও যে তাই কয়,
 মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তাকুণ্য ।'

৭ মার্চ, ১৯৪০

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
 আকস্ম ধ্যানী সে ।
 সাধনের মন্ত্র তাহার
 ভন্ডন্-ভন্ডন্কার ।
 সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ—
 দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
 কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
 বৈতবিহীন হয় বিশ্ব ।
 সূগন্ধ পচা-গন্ধের
 ভালো মন্দের
 ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন ;
 এক হয় পক্ষ ও চন্দন ।
 অঘোরপন্থ সে যে শবানন-সাধনায়
 ইদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
 বসে রয় স্তব্ধ,
 মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ ।
 ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য নীপ্তি
 ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি ।
 লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ত্ব,
 ভুলে যায় মাছিত্ত্ব ।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
 মাহুষের দক্ষ বা পৃষ্ঠ
 কিংবা তাহার নাসিকাস্ত
 তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্রান্ত—
 বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
 হার না মানিতে চায় কতু ও ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পৃথক করে না কতু ইষ্ট অনিষ্ট,
 জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ;
 সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ।
 সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত ;
 পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত ।
 এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
 শৌখিন কৃচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিহিমিছি ।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে ;
 কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে ।
 বিশ্বামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
 রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
 ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
 বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলা কে-ই !

চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার,
 তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার ।
 আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
 সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই ।
 এই তার বিজ্ঞানী কোশল,
 স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল ।

মানুষের মারণের লক্ষ্য
 কিন্তু এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ ।
 নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
 কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয় ।
 ভন্-ভন্-ভন্কার
 আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার ।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
 বার বার তাড়া খেয়ো, নাচি হোয়ো কান্ত ।

অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ

কখন অকস্মাৎ—

তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,

স্বযোগের পেলো নামগন্ধ

চ'ড়ে ব'সো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,

ক'রো তারে বিষম অতিষ্ঠ ।

সার্থক হতে চাও জীবনে,

কী পহরে, কী বনে,

পাঠ লহ প্রয়োজনসিদ্ধের

বিরক্ত করবার অদম্য বিশ্বের—

নিত্য কানের কাছে ভন্ডন্ ভন্ডন্

লুকের অপ্রতিহত অবলম্বন ।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে

ঘতই আমি নাবছি

আমায় মনে আছে কিনা

ভয়ে ভয়ে ভাবছি ।

কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,

হাই তুললে ছুটো ;

বললে উস্খুস্খু করে,

“কোথায় গেল ছুটো ।”

ভেকে তারে বলে দিলে,

“ড্রাইভারকে বলিস,

আজকে সন্ধ্যা নটার সময়

ধাব যেটোপলিস ।”

কুকুরছানার ল্যাঙ্গটা ধরে

করলে নাড়াচাড়া ;

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বললে আমার, “কমা করো,
যাবার আছে তাড়া।”

তখন পষ্ট বোঝা গেল,
নেই মনে আর নেই ।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই—
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি ;
কুকুরছানার ল্যাজের দিকে
পড়ত নাকো দৃষ্টি ।
সেই সেদিনের সহস্র রঙটা
কোথায় গেল ভাসি ;
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রক্ত-মাখানো হাসি ।
বুটস্বচ্ছ পা-ছখানা
তুলে দিলে সোফায় ;
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুঁসে
ঘা লাগালে ধোঁপায় ।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কুলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে ।

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব কিরে আবার ।

তুমি

ঐ ছাপাখানাটার ভূত,
 আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত ।
 দশটা বাজল তবু আস নাই ;
 দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই ;
 মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
 পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
 ঘাটে নাই । কাব্যের দখিটা
 বেশ করে অমে গেছে, নদীটা
 এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
 খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও ।
 কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
 স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয় ।
 বচনের তার ঘাড়ে ধরেছি,
 চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি ;
 বয়স হয়েছে আশি, তবুও
 সে ভার কি কমবে না কভুও ।

আমার হাতেছে মনে বিশ্বাস—
 সকালে ভুলাল তব বিশ্বাস
 রান্নাঘরের ভাজাতুজিতে,
 সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
 উত্তলা আছিল তব মনটা,
 স্নানতে পাও নি তাই ঘণ্টা ।

ওঁটকিমাছের যারা রাঁধুনিক
 হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক ।

তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
 বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা ।
 সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
 বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ ।
 রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
 কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে ।
 ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
 ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া ।
 আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
 বাসি ধূতি, পিঠ চাকা কোঁচাতে
 চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
 আলুখালু চুলে নাই পোমাটো ।
 বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
 গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে ।
 কাঁকড়ার চচ্‌ড়ি রাত্রে,
 এঁটো তারি পড়ে আছে পাত্রে ।
 'সিনেমার তালিকার কাগজে
 কে সরাল ছবি' ব'লে রাগো যে ।

যত দেরি হতেছিল ততই যে
 এই ছবি মনে এল স্বতই যে ।
 ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
 অতিশয় খুঁতখুঁতে রীতিটা ।
 সাফ্‌সোফ্‌ বুর্জোয়া অঙ্গেই
 ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
 মিল তার জানি অতিমাত্র—
 তুমি তো নও সে সং-পাত্র ।
 আজকাল বিড়িটানা শহরে
 যে চাল ধরেছ আঁটপহরে,

মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য ।

শান্তিনিকেতন

৪ অগস্ট, ১৯৪০

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পশু কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি ।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গল্প কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাকার ।
প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পশু তাহার প্রমাণ হল সেই ।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগল্প বিছান মহাকাল ।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে ।

সৃষ্টিকার্ষে আলো এবং আধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বীধার ।
আগরণে আছেন তিনি শুষ্ক জ্যোতির দেশে,
আলো-আধার 'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে ।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অস্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা ।
বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎকণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই ।
গোলাপগুলোর পাপড়ি-চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথা ।

বিস্তৃত ইচ্ছিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
 কিসের বা ইচ্ছিত সে জিনিস, ভেবে কে পায় দিশে ।
 নিউস্পেণার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
 মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্য ।
 কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
 যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার ।
 আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
 কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা ।
 ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
 কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি ।
 বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
 সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি ।
 ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
 নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ কলরব ।
 হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে ।
 এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘূমে ।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন

১৯ জানুয়ারি, ১৯৩১ । সন্ধ্যা

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী !

যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি ।
 মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
 পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
 আমারি লেখার ঘরে আশ্রি তার শ্রাস্ত কি !
 যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
 অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—

আমারি চরণজাত তাহাদের খাত্ত কি !
 বাশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
 পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-ছোড়া পাখ সে—
 দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাত্ত কি ।
 আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
 এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
 মশারি দিনের বেলা কতু আচ্ছাত্ত কি !
 গাল তারে মিছে দিই অতি অভাব্য,
 হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—
 এ কাজে লাগাব শেষে চটি-ছোড়া পাত্ত কি ।
 পুজোর বাজারে আশ্রি যদি লেখা না ছোটাই,
 ছুটো লাইনেবো মতো কলমটা না ছোটাই—
 সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ কি ।

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—
 জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
 আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা !
 কী হল যে দশা—
 মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
 হয়ে গেছি মশা ।
 দীন হতে দীন আমি
 কীণ হতে কীণ—
 একমাত্র নাম অপ করেছি ভয়সা ।

হিংস্র নীতি নাহি আর,
 অতি শাস্ত নিবিহার

ভক্তের নাসাগ্র-'পরে শুক হয়ে বস—
কী হল যে দশা!

মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভেঁা ভেঁা শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি জানা হতে ধসা,
হেন হীন দশা।

জোড়াসাঁকো

৩০।১০।৪০

আকাশপ্রদীপ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
কল্যাণীয়েষু

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের
কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো
অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি! তাই,
আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই
বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক
সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আধার,

ফুরিয়ে গেল বেলা,

ঘরের মাঝে গান হল

চেনা মুখের মেলা ।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা

নয়ন ছলোছলো,

এবার তবে ঘরের প্রদীপ

বাইরে নিয়ে চলো ।

মিলনরাতে সাক্ষী ছিল ধারা

আজ্ঞা জলে আকাশে সেই তারা ।

পাণ্ডু-আধার বিদায়রাতের শেষে

যে তাকাত শিথিরসজ্জল শূন্যতা-উদ্দেশে

সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে

অশ্লোকের প্রাস্তঘাটের কাছে ।

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বলাই আকাশ-পানে-

যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে ।

[শাস্তিনিকেতন]

২৪।২।৩৮

আকাশপ্রদীপ

ভূমিকা

স্বভিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি ।

এই দাবি

জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন প'ড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক ।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে ।
“রহিল” বলিয়া যায় অনূশুর পানে ;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে ।
আমি বহু কণহায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলম্বদিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহায়েই বাঁচা ব'লে মানি ।

[শান্তিনিকেতন]

১৬/৩/৩২

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে ।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,

হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
 অন্ন তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি ।
 মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
 কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর হুড়ি ।
 সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
 পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে ।
 শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
 হালকা ক'রে বুঝিয়ে সে দেয় কই ।
 বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই—
 কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই ।

কুন্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
 দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা ।
 আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট
 দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট ।
 মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
 দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে ।
 অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
 যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
 ভালোমন্দে লড়াই অনিশ্চেষ্ট,
 প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার ঘেঁষ ।
 বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
 সামনে এল, রইল বসে চুপ ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
 হয়তো বা এক বাধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
 যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
 আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম একেবেঁকে ।
 সব-জানা দেশ এ নয় কত, তাই তো তেপান্তরে
 রাজপুত্রুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে ।

সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন যানকটার ।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাধন-ডোর ।

আলমোড়া

২১৬/৩৭

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্রাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অনুরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে ।
পুরোনো আমড়াগাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুণ্ডিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্তবর্ষার ।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সত্ত্বরহস্ত আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে ।
পিঠ রাধি কুঞ্চিত বকলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম ;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সন্ধারে
রসরক্তধারে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
 একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে ।
 সেই মৌনী বনস্পতি
 সূর্যহং আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিতগতি
 সূক্ষ্ম সধকের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
 মাটিতে বাতাসে,
 লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
 তেজের ভোজের পানালয়ে ।
 বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
 ছায়ায় একাকী,
 আলস্যের উৎস হতে
 চৈতন্তের বিবিধ দিগ্বাহী শ্রোতে
 আমার সস্বক্চ চরাচরে
 বিস্তারিছে অগোচরে
 কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
 দূর দেশে দূর কালে ।
 প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
 সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান ;
 নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ ;
 গাছের স্বরূপ
 সহজে অন্তর মোর করিত পরণ ।
 অনাদৃত সে বাগান চায় নাই ষণ
 উদ্ভানের পদবীতে ।
 তারে চিনাইতে
 মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো ।
 যেন কী আদিম সাঁকো
 ছিল মোর মনে
 বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আনার প্রয়োজনে ।
 কুলগাহ দক্ষিণে কুয়োয় ধারে,
 পূবদিকে নারিকেল সারে সারে,

বাকি সব জ্বল আগছা ।

একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্নে ছিল কারো, ডাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে ।

বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল

অভূতের ক্লিষ্ট ইশারার মতো । বাধানো চাতাল ;

ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে ।

পাঁচিল ছ্যাংলা-পড়া

ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনি-টানা নানামতো ছবির ইন্ধিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গীতে ।

সস্ত ঘুম থেকে জাগা

প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাত না কিছুতেই ।

কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই ।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,

কেবল চডুই,

আর ছিল কাক ।

তার ডাক

সময় চলার বোধ

মনে এনে দিত । দশটা বেলার বোদ

সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে

দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে ।

কালো অন্ধ চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গী, চাতুরী সতর্ক আধিকোণে,

পরস্পর ডাকাডাকি কণে কণে—

এ ত্রিস্ত বাগানটির দিয়েছিল বিশেষ কী দাম ।

দেখিতাম, আবছায়া ভাবনার ভালোবাসিতাম ।

[শাস্তিনিকেতন]

ধ্বনি

জন্মেছিল সূক্ষ্ম তারে বাধা মন নিয়া,
 চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
 নানা কম্পে নানা সুরে
 নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে
 বালকের মনের অন্তরে দিত আনি
 পাণ্ডুলীল আকাশের বাণী
 চিলের স্তূতিক সুরে
 নির্জন ছপরে,
 রৌদ্রের প্রাবনে যবে চারিধার
 সময়েরে করে দিত একাকার
 নিষ্কর্ম তন্ত্রার তলে ।

ওপাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
 মনেবে আগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
 অস্পষ্ট সংসারে ।

ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
 যে-সকল অলিগলি
 জানি নি কখনো
 তারা যেন কোনো
 বোগদাদের বসোরার
 পরদেশী পনরার
 স্বপ্ন এনে দিত বহি ।
 রহি রহি

রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক উদ্বিগ্নে,
 অস্তরে অস্তরে
 দিত সে ঘোষণা কোন্ অস্পষ্ট বার্তার,
 অসম্পন্ন উদ্যোগ যাত্রার ।
 একঝাঁক পাতি ইঁদুর
 টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ

পুকুরে পড়িত ভেসে ।
বটগাছ হতে বাকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি ।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে ।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে ।
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আছানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী ।
রৌদ্ররশ্মি ছুটির প্রহরে
আলস্ত-শিথিল শাস্তি ঘরে ঘরে ;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমুদ্রিত হাঁক হৈকে
বাস্পবাসী সমুদ্র-খেয়াল ডিঙা
বাক্স ইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রাস্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী ।
বাতায়নকোণে
নিবাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে ।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কতু অকস্মাৎ

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কতু যুহবেগে ধীরে
 ধ্বনিক্রমে মোর শিরে
 স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
 নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায় ।
 চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সূদূরে
 রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
 ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
 আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল ।
 যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
 শুধু যেথা কত কী যে হয়—
 কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
 নাহি মেলে উত্তর বখনো ।
 যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
 ইন্দ্ৰিতের অমুপ্রাসে গড়া—
 কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন হুলায়ে
 মনেরে তুলায়ে
 নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
 বোধের প্রত্যয়ে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে ।

[শাস্তিনিকেতন]

২১।১০।৩৮

বধু

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
 ভাবপানা মনে আছে—“বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
 আম-কাঠালের চায়ে,
 গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে ।”

বালকের আগে
 প্রথম সে নারীময় আগমনীগানে

ছন্দের লাগাল দোল আধোপ্রাণা কল্পনার শিহরদোলায়,
 আঁধার-আলোর বন্ধে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
 সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি মীমা
 দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা ।
 ছড়া-বাধা চতুর্দোলা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া
 চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
 গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় একেবেঁকে ।
 তারি প্রান্ত থেকে
 অশ্রুত মানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাণার সুরে
 দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে ।
 সেদিন সে কল্পলোকে বেহায়াগুলোর পদক্ষেপে
 বন্ধ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
 পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
 পথ শেষ হবে না কভুও ।

সেকাল মিলাল । তার পরে, বধু-আগমনগাথা
 গেয়েছে মর্মসহস্রেন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা ;
 বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিস্র নিশীথে ;
 মধ্যাহ্নে করুণ রাগিনীতে
 বিদেশী পাছের শ্রান্ত সুরে ।
 অতিদূর মায়াময়ী বধুর নূপুরে
 তন্দ্রায় প্রত্যস্তদেশে জাগিয়েছে ধ্বনি
 মুহূ রণরণি ।
 ঘুম ভেঙে উঠেছিল জেগে,
 পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
 দি়েছিল দেখা
 অনাগত চরণের অলঙ্কার রেখা ।
 কানে কানে ডেকেছিল মোরে
 অপরিচিতার কণ্ঠ সিস্ক নাম ধ'রে—
 সচকিতে
 দেখে তবু পাই নি দেখিতে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
 রহস্যের তীব্রতার দেহে মনে আগল হরষ ;
 তাহারে শুধায়েছিলুম অভিভূত মুহূর্তেই,
 “তুমিই কি সেই,
 আধারের কোন্ ঘাট হতে
 এসেছ আলোতে !”

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিহ্বল ;
 ইন্ধিতে জানায়েছিল, “আমি তারি দূত,
 সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
 নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ।
 নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
 যার নাম লেখা রহিয়াছে
 অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
 ফিরিছে সে চির-পথভোলা
 স্ফোঃতিকের আলোছায়ে,
 গলায় মোতির মালা, দোনার চরণচক্র পায়ে ।”

[শাস্তিনিকেতন]

২৫।১০।৩৮

জল

ধরাভলে

চঞ্চলতা সদ-আগে নেমেছিল জলে ।
 সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল ছেগে
 তারি স্রোতোবেগে ।
 তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
 কলোলোলে উষ্মল উচ্ছল
 শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
 নৃত্যহীন ঔদাসীন্ডে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার ।
 গান নাই, শব্দের তরঙ্গী হোথা ভোবা,
 প্রাণ হোথা বোবা ।

জীবনের রক্তমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বয়নের মানা ।

ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তরু সময় ।

হোখা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া

ইতিহাস-পলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানাযতো ।

উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে

না-দেখা গভীরে এর মায়াপুরী এঁকেছিল মনে ।

নাগকন্ঠা মানিকমর্পণে

সেখার গাঁথিছে বেণী,

কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী

ভেসে যার বঁকে বঁকে

যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে ।

তীরে যত গাছপালা পলুপাশি

তারা আছে অন্তলোকে, এ শুধু একাকী ।

তাই সব

যত কিছু অসম্ভব

কল্পনার মিটাইত সাধ,

কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ ।

তার পরে মনে হল একদিন,

সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,

বন্দী তারা যারা পায় নাই ।

এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই

ভূমির নিবেদগতি হতে পার ।

অনাশ্রয় শক্রতার

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
 জলে আর তীরে
 আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।
 আকড়িয়া সঁতারের ঘড়া
 অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
 অচেনার প্রাশ্নসীমা লয়েছিহু চিনে।
 পুলকিত সাবধানে
 নামিতাম স্নানে,
 গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
 ধরিত জড়ায়ে।
 হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
 দেহময়
 রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পূর্বতীরে বৃক্ষ বট প্রাচীন প্রহরী
 গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
 যেন পাতালের নাগলোকে।
 এক দিকে দূর আকাশের সাথে
 দিনে রাতে
 চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
 অন্য দিকে দূরনিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
 কিসের সন্ধানে
 অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।
 সেই পুকুরের
 ছিহু আমি দোসর দূরের
 বাতায়নে বসি নিরালায়,
 বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায় ;
 তার পরে দেখিলাম, এ পুকুর এও বাতায়ন-
 এক দিকে সীমা বাধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।

করিয়াছি পারাপার
ষত শত বার
ততই এ তটে-বাধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি কণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের অয়,
গেছে চলি ভয় ।

[শান্তিনিকেতন]

২৬/১০/৩৮

শ্যামা

উজ্জল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি ।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে ।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার ।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি । ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা ।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে ।
ছুখানি সোনার চুড়ি নিটোল ছু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল । ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে ।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ ছায়া

রবীন্দ্র-রচনাবলী

স্বপ্ন স্পর্শময়ী ।

সাহস হল না কথা কই ।

হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমুহু গুঞ্জরিত স্বরে—

ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,

যত দূরে শিরীষের উর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে

কীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে ।

একদিন পুতুলের বিয়ে,

পত্র গেল দিয়ে ।

কলরব করেছিল হেসে খেলে

নিমন্ত্রিত দল । আমি মুখচোরা ছেলে

একপাশে সংকোচে পীড়িত । সন্ধ্যা গেল বৃথা,

পরিবেষণের ভাগে পেয়েছিহু মনে নেই কী তা ।

দেখেছিহু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,

কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে ।

কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ

দু হাতে পড়েছে যেন বাধা । অহুরোধ উপরোধ

ভুনেছিহু তার স্নিগ্ধ স্বরে ।

ফিরে এসে ঘরে

মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি

অর্ধেক রজনী ।

তার পরে একদিন

জানাশোনা হল বাধাহীন ।

একদিন নিয়ে তার ডাকনাম

তারে ডাকিলাম ।

একদিন ঘুচে গেল ভয়,

পরিহাসে পরিহাসে হল দৌছে কথা-বিনিয়ম ।

কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ

ঘটায়েছে ছল-করা রোষ ।

কখনো বা স্নেহবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল হৃদয় ।

কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ ।

কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাক্ষ—

রক্তনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ ।

পুরুষসুলভ যৌর কত মূঢ়তাবে
ধিকার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে ।

একদিন বলেছিল, “আনি হাত দেখা ।”

হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—

বলেছিল, “তোমার স্বভাব

প্রেমের লক্ষণে দীন ।” দিই নাই কোনোই জবাব ।

পরশের সত্য পুরস্কার

খণ্ডিতা দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার ।

তবু ঘুচিল না

অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা ।

স্বপ্নের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,

কাছে পেয়ে না পাওয়ার দের অফুরন্ত পরিচয় ।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন

পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন ।

চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,

আশ্বিনের আলো

বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই ।

চলেছে যত্ন তরী নিরুদ্ধেশে স্বপ্নেতে বোঝাই ।

[শান্তিনিকেতন]

৩১।১০।৩৮

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
 গত জীবনের কথা,
 কাঁচা মনে ছিল
 কী বিষম মূঢ়তা ।
 শেষে ধিকারে বলি হাত নেড়ে,
 থাক গে সে-কথা থাক গে ।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
 ভয় ছিল হারবার,
 তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
 ফিরিয়েছ বার বার ।
 কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
 মনে দেয় নাই সুখ ।
 সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
 কম কি সে কোতুক
 ঘটটুক ছিল ভাগ্যে,
 দুঃখের কথা থাক গে ।

পঞ্চমী তিথি

বনের আড়াল থেকে
 দেখা দিয়েছিল
 ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে ।
 মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন,
 এ ছল কিসের অস্ত ।

পরিতাপে জলি আজ আমি বলি,
 সিকি চাঁদনীর আলো
 দেউলে নিশার অমাবস্তার
 চেয়ে যে অনেক ভালো ।

বলি আরবার, এসো পঞ্চমী, এসো,

চাপা হাসিটুকু হেসো,

আধখানি বঁকে ছলনার ঢেকে

না জানিয়ে ভালোবেসো ।

দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,

আমাকে করুক ধন্য ।

আজ খুলিয়াছি

পুরানো স্মৃতির ঝুলি,

দেখি নেড়েচেড়ে

ভুলের দুঃখগুলি ।

হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি

সকলি যে পরিহাস্ত ।

ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি

সেদিন সে কোন্ ছলে

আপনার ছবি দোখতে চাহিল

আমার অশ্রুজলে ।

এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাক্য হাসি,

পালা শেষ করো আসি ।

মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া

যাও মোরে সস্তাষি ।

আজ করো তারি ভাষ্য

যা ছিল অবিহাস্ত ।

বয়স গিয়েছে,

হাসিবার কমতাটি

বিখাতা দিয়েছে,

কুরাশা গিয়েছে কাটি ।

হুখহুর্দিন কালো বয়নের

মুখোশ করেছে ছিন্ন ।

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
 উঠে গেছে আজ কবি
 সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
 সব দেখে যেন ছবি
 ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
 মেখেছে কুশী রঙ ।
 দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
 ঘণ্টা বাজায় গলে ।
 কেবল ভিন্ন ভিন্ন
 সাদা কালো ষত চিহ্ন ।

[শান্তিনিকেতন]

২২/১১/৩৮

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
 বোবা কালো বস্তু ষত আছে
 দলবাধা এখানে সেখানে,
 কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে ।
 পিতলের ফুলদানিটাকে
 বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে ।
 ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
 না জানারি মতো ।
 পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা ;
 আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা—
 চোখে পড়ে পড়েও না ;
 জ্বালিমেতে ঝাঁকে আলপনা
 সাতটা বেলার আলো সকালে রোদ্দুরে ।
 সবুজ একটি শাড়ি ডুরে
 ঢেকে আছে ডেস্কোখানা ; কবে তারে নিয়েছিছ বেছে,
 রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,

আজ যেন সে রঙের আশুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
 আছে তবু বোলো-আনা নাই ।
 থাকে থাকে দেয়ালের
 এলোমেলো ভরা আছে ঢের
 কাগজপত্র নানামতো,
 ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
 জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার ।
 টেবিলে হেলানো ক্যালেন্ডার,
 হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ । লাভেগার
 শিশিভরা বোদুরের বঙে । দিনরাত
 টিক্‌টিক্‌ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ ।
 দেয়ালের কাছে
 আলমারিভরা বই আছে ;
 ওরা বারো-আনা
 পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা ।
 ওই যে দেয়ালে
 ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিল কোনো-এক কালে ;
 আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
 যেন ভূতে-পাওয়া ।
 কার্পেটের ডিজাইন
 স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন ;
 আজ অন্তরূপ,
 প্রায় তারা চূপ ।
 আগেকার দিন আর আজিকার দিন
 পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সঙ্কলবিহীন ।
 এইটুকু ঘর ।
 কিছু বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর ।
 টেবিলের ধারে তাই
 চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সঁকো,
ক্লেমে ক্লেমে অশ্রমণা

তারি 'পরে চলে আনাগোনা ।

আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ ।

পাশাপাশি ছায়া আর ছবি ।

মনে ভাবি, আমি সেই রবি,

স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা

ঘরের মতন ; বাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা

আসবাবগুলো যেন আছে অশ্রমণে ।

সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে ।

যাহা ফেলিবার

ফেলে দিতে মনে নেই । কল্প হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে ।

ক্রমে ক্রমে

অতীতের দিনগুলি

মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার । ছায়া তারা

নূতনের মাঝে পথহারা ;

যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে

সে কেহ পড়িতে নাহি জানে ।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন

১১/২/৩৮

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে

চলতেছিলেম হাতে ।

তুমি তখন আনতেছিলে জল,

পড়ল আমার বুড়ির থেকে

একটি রাঙা ফল ।

হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
 গড়িয়ে গেল তুলে,
 নিই নি ফিরে তুলে ।
 দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
 তুলতে এলে জল,
 অঙ্ককারে কুড়িয়ে তখন
 নিলে কি সেই ফল ।
 এই প্রলয় গানে গেঁথে
 একলা বসে গাই,
 বলার কথা আর কিছু মোর নাই ।

[শান্তিনিকেতন]

৩।১২।৩৮

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জানী,
 ছিল অনেক গুণী ।
 কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
 ভাঙল বিধার বাধ,
 সমস্বরে জাগল সাধুবাদ ।
 উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
 মণিমালার মান,
 স্বয়ং রাজার দান ।
 রাজধানীময় শশের বন্যাবেগে
 নাম উঠল জেগে ।

দিন কুরাল । খ্যাতিক্রান্ত মনে
 যেতে যেতে পথের ধারে
 দেখল বাতায়নে,
 তরুণী সে, ললাটে তার
 কুঁচুমেরি ফোঁটা,
 অলকেতে সস্ত্র অশোক ফোঁটা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধ্যাবেলার বাতাস গন্ধে ভরে ।
নিখাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে ।

[শাস্তিনিকেতন]

৩।১২।৩৮

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অজ্ঞানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে ;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে ।
বিকেল বেলায় রোদহরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ঐ তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি ।
মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁওয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইচ্ছিত
বাক্যের অতীত ।

ঐ যে বাকলখানি

রয়েছে ওর পর্দা টানি

ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
 বলা কওয়া কী হয় দিনে রাতে,
 পরের মনের স্বপ্নকথার সম
 পৌঁছবে না কোতূহলে মম ।
 দুয়ার-দেওয়া যেন বাগরঘরে
 ফুলশস্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
 অমুমানেরই জানি,
 আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী ।
 ফাগুন আসে বছরশেষের পারে,
 দিনে-দিনেই ধবর আসে ঘরে ।
 একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
 অবাক শ্রামলতার তলে
 শিকড় হতে শাখে শাখে
 ব্যাপ্ত হয়ে থাকে ।
 অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
 মুকুলে মুকুলে ।

শ্রামলী, শান্তিনিকেতন

৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
 মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
 আসবে শালিখ পাখি ।
 চাতালকোণে বসে থাকি,
 ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো ।
 স্নিগ্ধ আলো
 এ অন্ধারের শিশিরছোঁওয়া প্রাতে,
 সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে

শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে—
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে ।

আড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লালচে-কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে ।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে-ছলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান ।

ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই ।

পরস্পরে একসমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রান্তরাশে ।
মাঝে-মাঝে কী অকারণ জ্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে ।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে ।

এমনসময় আসে কাকের দল,
খাণ্ডকণায় ঠোকর মেয়ে মেখে কী হয় ফল ।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে ।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার ।
এবার মনে হয়,
এতক্ষণে পরস্পরের ডাঙল সমন্বয় ।

কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
 সন্দেহ আর সতর্কতায় ছলছে সারাক্ষণ ।
 প্রথম হল মনে,
 তাড়িয়ে দেব ; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
 পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
 আমার মতোই সমান অধিকার ।
 তখন দেখি, লাগছে না আর মন্দ
 সকালবেলার ভোজের সভায়
 কাকের নাচের ছন্দ ।

এই যে বহায় ওরা

প্রাণশ্রোতের পাগ্‌লাঝোরা,
 কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
 সেই কথাটাই ভাবি ।
 এই খুঁশটার স্বরূপ কী যে, তারি
 রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি ।
 চটুলদেহ দলে দলে
 ছলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাণ্ডভোগের ছলে,
 এ তো নহে এই নিমেষের সঙ্গ চঞ্চলতা,
 অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা ।
 রক্ষে রক্ষে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
 কালের বাঁশির মৃত্যুরক্ষে, সেই মতো উচ্ছ্বাসি
 উৎসারিছে প্রাণের ধারা ।
 সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অস্তহারী
 দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ ।
 পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ ।
 আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্‌ সূদূর কেন্দ্র হতে
 অবিশ্রান্ত শ্রোতে
 নানা রূপের বিচিত্র গীমায়
 ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা স্বপ্নিমায়

তেমনি যে এই সস্তার উচ্ছ্বাস
 চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
 যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
 হয় না ক্লাস্ত অনাদি সেই ধারা ।
 সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
 সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
 আমার চোখের কাছে
 ভিড়-করা ঐ শালিখগুলির নাচে ।
 আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
 রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে ।
 তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
 বিরূপ বিপরীত—
 প্রাণের সহজ সুসমা যায় ঘুচি,
 চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি ;
 পরাভূত হতভাগ্য মোর ছয়াবের কাছে
 কত-অন্ধে শরণ যাগিয়াছে ।
 দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
 হিংসার ক্রুদ্ধতা—
 যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
 শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবান—
 অহংকৃত কণিকতার অলৌক পরিচয়,
 অসীমতার মিথ্যা পরাজয় ।
 তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
 সহজ চিরন্তন ।
 প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
 মহাকালের প্রাক্গেতে নৃত্য করে আসি ।

বেজি

অনেকদিনের এই ডেস্কে—

আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কা

দিয়েছে বিস্তর দাগ ভূতুড়ে রেখার ।

ষমজ সোদর ওরা যে সব লেখার—

ছাপার লাইনে পেল উদ্ভবেশে ঠাই,

তাদের স্বরণে এরা নাই ।

অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, পদকল্পতরু,

ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'

ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,

এগুলোর একপাশে চা রয়েছে চাকা

পেরালায় মডার্ন রিভিযুতে চাপা ।

পড়ে আছে সত্ত্বছাপা

প্রফুল্লো কুঁড়েমির উপেকায় ।

বেলা যায়,

ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,

বৈকালী ছায়ার নাচ

মেঝেতে হয়েছে শুক, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা ।

খাতাখানি আছে খোলা ।—

আধঘণ্টা ভেবে মরি,

প্যাছোজ্‌ম্ শব্দটাকে বাংলায় কী করি ।

পোষা বেজি হেনকালে ক্রতগতি এখানে সেখানে

টেবিল-চৌকির নিচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধান—

হুই চকু ঔৎসুক্যের দীপ্তিজ্বলা,

তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা

দামি দ্রব্য যদি কিছু থাকে ;

স্বাণ কিছু মিলিল না তীর নাকে

ঈপ্সিত বস্তুর। ঘুরে ফিরে অবজায় গেল চলে ;
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরম্ভলার খোজ নেই ব'লে ।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যাছীজ্‌ম্ শব্দটার বাংলা বুদ্ধি নেই ।

[শান্তিনিকেতন]

৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

যাত্রা

ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাই,
স্পষ্ট মনে নাই ।

উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে ।
পাশাপাশি তারি

আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত,

একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিঙ্গিত ।

সরকারী বা আইনকানুন তাহার যথাযথ্য

অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব

রুদ্ধহয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা ;

এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন ঢাকা,

ভিন্ন ভিন্ন চাল ।

অদৃশ্য তার হাল,

অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,

সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই ।

প্রত্যেকেই রিজার্ভ-করা কোর্টর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;

দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র

মুক্ত চোখের 'পরে

সমান সবার তরে,

তবুও সে একান্ত অজানা,
 তরলতর্জনী-তোলা অলজ্য্য তার মানা ।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে । ডিনার-টেবিলে
 খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অকরাগের স্ফুগন্ধ যায় মিলে—
 তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
 ইলেকট্রিকের আলো-জ্বালা কক্ষমাঝে
 একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই যেশা
 চক্ষু কানের স্বাদের স্বাপের সম্মিলিত নেশা
 কিছুক্ষণের তরে
 মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে ।
 চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
 বুদ্ধুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত ।
 বাইরে রাত্রি তারার তারাময়,
 ফেনিল সুনীল তেপাস্তরে মরণ-ঘেরা ভয় ।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
 জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নিচে ।
 খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবঁাকে
 কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে ।
 কোথাও দেখি সেলুন-ঘরে ঢুকে,
 কুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনার-ময় মুখে ।
 হোথায় রান্নাঘর ;
 রান্নাঘরের সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর ।
 গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
 স্নানের ঘরে জায়গা পাবার সুরা ।
 নিচের তলার ডেকের 'পরে কেউ বা করে খেলা,
 ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
 বৃকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিজা যায়,
 পায়চারি কেউ করে অরিত পায় ।

স্টুয়ার্ড্ হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শব্দং ।
 আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন-ঘরের পথ
 নেহাত খতোমতো ।
 সে শুখাল, নম্বর তার কত ।
 আমি বললেম যেই,
 নম্বরটা মনে আমার নেই—
 একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
 ঘেমে উঠি উদ্বেগে আর লাঞ্জে ।
 আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
 চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে ।
 যেটাই দেখি মনেতে হয়, এইটে হতে পারে ;
 সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে ।
 ভাবছি কেবল, কী যে করি, হল আমার এ কী—
 এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি,
 নিছক স্বপ্ন এ যে,
 এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে যে ।

গভীর রাত্রি ; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সাসি,
 রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাশি ।

[শাস্তিনিকেতন]

২৬।২।৩২

সময়হারা

খবর এল, সময় আমার গেছে
 আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
 বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই ;
 সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
 ক্রমে ক্রমে
 উঠছে জমে জমে
 আমার হাতের খেলনাগুলো,
 টানছে ধুলো ।

হাল আমলের ছাড়পত্রহীন

অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটার জোড়াতাড়ার দিন ।

ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই ;
ইচ্ছে করে, পৌষমাসের হাওয়ার ভোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে ।

আধপেটা খাই শালুক-পোড়া ; একলা কঠিন ভূঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে

ঘুম হারিয়ে কণে কণে

আউড়ে চলি শুধু আপন-মনে—

“উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিয়ে ধানের খই,
সক ধানের চি ড়ে দেব, কাগমারে দই ।”

আমার চেয়ে কম-ঘুমন্ত নিশাচরের দল

খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কা নিফল ।

কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর,

শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, “সাত্তাত মোর,

আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে থাকে দাওয়াই ?”

নেই কিছু তো, দু-এক হিলিম তামাক সেজে খাওয়াই ।

একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর

সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর ।

দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্তমনা ;

গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা

সেই দালানের বাহির ঝোপে ;

ধামের মাথায় ধোপে ধোপে

পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্-বকম্ ।

আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার বকম্-বকম্

লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,

হলদে সাদা বেগনি ফুলে

আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি ।

ছাতিমগাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি

স্বপ্ন-রচনাবলী

শব্দমণির খালে,

মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্ত্রানিব্বম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো ।

পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,

অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট ।

চক্ষু বুজে ছবি দেখি—কাংলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে ।

ঝাউঙ ডিটার 'পরে

কাঠঠোকরা ঠকঠকিয়ে কেবল প্রপ্ন করে ।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিঁপোকাকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্

ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান সুরতা-সংগীতে

লেগেই আছে একঘেষে সুর দিতে ।

আধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে

কল্মিদিঘির ভাঙা পাড়ির থেকে ।

পেঁচার ডাকে বাশের বাগান হঠাৎ ভয়ে আগে,

তন্ত্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে ।

বাহুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি,

দাঁড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্তি ।

রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে

তাকধুমাধুম বাস্তি বাজে ।

তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে

মনে-মনে,

ঝড়েতে কাত জাকলগাছের ডালে ডালে

পিরুতু নাচে হাওয়ার তালে ।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি

হলুম বনগাঁবাসী ।

সময় আমার গেছে ব'লেই সময় থাকে পড়ে,
 পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেরাল গ'ড়ে ।
 সজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
 গোধূলিতে স্থব্ধিমামার বিয়ে ;
 মাঝি থাকেন, সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
 আলতা পারে আঁকা ।

এইখানেতে ঘুঘুভাঙার খাঁটি ধবর মেলে
 কুলতলাতে গেলে ।

সময় আমার গেছে ব'লেই আনার সুযোগ হল
 'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ঐ যে খোলো খোলো
 আগাছা জ্বলে
 সবুজ অঙ্ককারে যেন বোদের টুকুরো জ্বলে ।
 বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
 পরের গোকু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
 হাতার মধ্যে আসে ;
 আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে ।
 আগে ছিল সাট্‌ন বীজে বিলিতি মোসুমি,
 এখন মকুভূমি ।

সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
 মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলি ঘেউ-ঘেউ
 লাগায় আমার ঘারে ; আমি বোঝাই তারে কত,
 আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো

ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু—
 শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু ।
 অনাদরের কতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
 জানিয়ে দিলে, লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটের 'পরে
 অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান ।

দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
 এমনতরো মিলবে কোথায় । সময় গেছে তারই,
 সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই ।

সময় আমার গিয়েছে, তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই ;
 রবিশস্ত্রে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই ।
 খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁহরগুলো ঢুকে
 দিল কখন ফুঁকে ।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
 সারাদিনে জনামাত্র নেইকো ধরিদার ।
 কালের অলস চরণপাতে
 ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে ।
 ওরি ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের খালা
 চড়ুইপাখির অগ্নে আমার খোলা অতিথশালা ।

সন্ধ্যা নামে পাতাবরা শিমুলগাছের আগায়,
 আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
 মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটির পথে
 স্বপ্নমনোরথে ;

কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
 শুনি কে কয় আমার ডেকে,—

“ওরে পুতুলগলা

তোমার যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
 সেখায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে
 লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা কণিক কালের পাছে ;
 আজ চেয়ে দেখ, দেখতে পাবি,
 মোদের দাবি

ছাপ-দেওয়া তার ভালো ।

পুরানো সে নতুন আলোর জাগল নতুন কালে ।
 সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
 সবার চক্ষে নেই—

এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলগলা,
 আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা ।

ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,

ছেঁড়া মলিন কাঁথা—

ঐ যে বলিস, জোটে কেবল সিঁদ্ধ কচুর পথি—

এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি ।

পাস নি খবর, বাহ্যিক জন কাহার

পাল্কি আনে— শব্দ কি পাস তাহার ।

বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,

সখীর সঙ্গে আসছে রাজ্যের মেয়ে ।

খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,

এবার নেবে কিমে ।

কৌ জানি বা ভাগ্য তোমার ভালো,

বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো ;

নবযুগের রাজকল্পা আধেক রাজ্যহুঁহু

যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,

ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে

উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে ।

বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে

বলবে তাকে, একটা যুগের পরে

চিরকালের বয়স আসে সকল-পান্ডি-ছাড়া,

যমকে লাগায় তাড়া ।”

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—

নবীন বিচারপতি ওগো, আমি কুমার পাত্র ;

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারী

স্বপ্নে ছাড়া সাধনা আর কোথায় পাবে তারা

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
 চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
 সে কথা শুধাও হবে মোরে
 স্পষ্ট ক'রে
 তোমারে বুঝাই
 হেন সাধ্য নাই ।
 রসনার রসিয়েছে, আর কোনো মানে
 কী আছে কে জানে ।
 জীবনের যে সীমায়
 এসেছ গস্তীর মহিমায়
 সেখা অপ্রমত্ত ভূমি,
 পেরিয়েছ ফাস্তনের ভাঙাভাঙ উচ্ছিষ্টের ভূমি,
 পৌছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
 এ কথাই বুঝি মনে আসে
 না ভাবিয়া আশুপিছু ।
 কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু ।
 হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
 পরিণতফলনয় অপ্রগলভ যে মর্ষাদা আসে
 আশ্রভালে,
 দেখেছি তোমার ভালে
 সে পূর্ণতা স্তব্ধতামহুর—
 তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর ।
 অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অস্তিম চাপায়
 মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
 নিকুঞ্জের স্নান যুহু ভ্রাণে,
 সেই ভ্রাণ একদিন পাঠিয়েছ প্রাণে,
 তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
 জাগারে দিয়েছে নামধানি ।

সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
 তোমায়ে গুঞ্জন করি ঘিরে
 চারিদিকে,
 ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে ।
 তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
 শুকতারা, তোমার উদয়
 অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
 মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা ।
 তাই বসে একা
 প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ দেখা ।
 সেই দেখা মম
 পরিস্ফুটতম ।
 বসন্তের শেষমাসে শেষ গুরুতিথি
 তুমি এলে তাহার অতিথি,
 উজাড় করিয়া শেষ দানে
 ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অস্ত নাহি জানে ।
 ফাস্তনের অতিতৃপ্তি ক্লাস্ত হয়ে যায়,
 চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
 চৈত্রেই সে ঘন দিন তোমার লাষণ্যে মূর্তি ধরে ;
 মিলে যায় সায়ঙের বৈরাগ্যরাগের শাস্তস্বরে,
 শ্রৌচ যৌবনের পূর্ণ পর্ষাপ্ত মহিমা
 লাভ করে গৌরবের সীমা ।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অস্তে চিন্তা করে বলা,
 দাস্তিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা—
 বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই ।
 জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
 যেমন চমকি ভেগে উঠে
 সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,

সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তুলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা ।

পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্ভাস্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ

বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ ।

সেই রহস্যই নারী—

নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি ;
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায় ।

উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে,

কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে ।

বসন্তে নাগকেশরের স্নগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাহ্নব মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল ।

বনতলে মর্মরিয়া কাপে সোনাবুরি ;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী ;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিপি কিংশুকে অশোকে ;
হাওয়ার বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি ।

এই ধারে মায়াবধে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজের সত্য করে জানে

সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার ।

রক্তশ্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঙ্কার আহত

ছিন্ন মঞ্জরীর মতো

নাম এল ঘুণবায়ের ঘুরি ঘুরি,

চাপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী

চৈত্রপূর্ণিমা [২১ চৈত্র], ১৩৪৫

[৭ শাস্তিনিকেতন]

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে

বামুনমারা দিঘির ঘাটে

আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আসমানি এক চেলা

ঠিক ছুকুর বেলা

বেগ্নি-সোনা দিক্-আঙিনার কোণে

ব'সে ব'সে ভুঁইছোড়া এক চাটাই বোনে

হলদে রঙের শুকনো ঘাসে ।

সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে

ঘুম-লাগা রোদ্‌ধুরে

ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,

স্বন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে ।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে

স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে ।

মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,

সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি ।

বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,

এই বারতা ধুলোর-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে

উত্তাপহীন, ঝাঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো ।

ছঃসহ দিন ছঃখেতে বিকৃত

এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
 আশুন-নেভা ছাইয়ের মতন কাঁকি ।
 সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
 পড়ল এসে সজীব বর্তমানে ।

তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
 হৌঁ মেরে ষায় ছড়াটারে,
 এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
 টুকুরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে ।
 জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে ষায় ব্যেপে,
 ধোঁয়াটে এক কবলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
 রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
 ‘ঢাকিয়া ঢাক বাজায় খালে বিলে।’

অমিদারের বুড়ো হাতি হেলে ছলে চলেছে বাঁশতলায়,
 চঙ্চঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায় ।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
 ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে ।
 হঠাৎ দেখি, বুকে বাজে টন্টনানি
 পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি ।
 চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
 কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
 বুড়ি ভ’রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
 সামান্ত তার দাম,
 ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
 আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা ।
 ঐ যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—
 কদিন হল জানি নে কোন্ গোয়ার খুনি
 সম্মুখ তার নাতনিটিকে
 কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে ।

আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
 যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চূকে ।
 বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
 সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায় ।
 শাস্ত্রমানা আন্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
 'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে ।
 অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে ।'

জমিদারের বুড়া হাতি হেলে ছলে চলেছে বাশতলায়,
 ঢঙ চড়িয়ে ঘণ্টা দোলে গলায় ।

শান্তিনিকেতন

২৮/৩/৩২

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অস্তরে মিলায়ে
 সেই অভিপ্রায়ে
 রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারময়ী কায়ী—
 তারি সঙ্গে মিলালেন অন্ধের অতীত কোন্ মায়া
 যারে নাহি যায় ধরা,
 যাহা শুধু জাহ্নমেরে ভরা,
 যাহারে অস্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য অলোকে
 দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
 ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
 না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি ।
 যার ছায়া সুরে খেলা করে
 চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে ।
 'নিশ্চিত পেয়েছি' ভেবে যারে
 অবুঝ থাকি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
 ডুবায় সে ক্লাস্তি-অবসাদে
 সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা ।

দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
 চরিতার্থ করে সেই কাছের পাওয়ারে,
 পূর্ণ করে তারে ।

নারীশুব শুনালেম । ছিল মনে আশা—
 উচ্চতন্বে-ভরা এই ভাষা
 উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
 পাব পুরস্কার ।

হায় রে, দুঃখ হুগুণে

কাব্য শুনে

ঝকঝকে হাসিখানি হেসে

কহিল সে, “তোমার এ কবিত্বের শেষে

বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন

আগাগোড়া সত্যহীন ।

ওরা সব-কটা

বানানো কথার ঘটা,

সদরেতে যত বড়ো অন্তরেতে ততখানি ফাঁকি ।

জানি না কি—

দূর হতে নিরামিষ সাম্বিক যুগয়া,

নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিস্তৃত এ দয়া ।”

আমি শুধালেম, “আর, তোমাদের ?”

সে কহিল, “আমাদের চারিদিকে শক্ত আছে ঘের

পরশ-বাচানো,

সে তুমি নিশ্চিত জান ।”

আমি শুধালেম, “তার মানে ?”

সে কহিল, “আমরা পুষ্টি না মোহ প্রাণে,

কেবল বিক্রম ভালোবাসি ।”

কহিলাম হাসি,

“আমি যাহা বলেছি সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে ।

মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে ।”

সে কহিল একটুকু খেমে,

“নেই বলিলেই হয় । এ কথা নিশ্চিত—

জোর করে বলিবই—

আমরা কাঙাল কতু নই ।”

আমি কহিলাম, “ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের দ্বিত ।”

“কেন তুনি”

মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী ।

আমি কহিলাম, “যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,

মোহ তবে রসনার রস ।

সে সূধার পূর্ণ স্বাদ থেকে

মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে ।

আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়,

তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া ।

প্রেম আর মোহে

একেবারে বিক্রম কি দোহে ।

আকাশের আলো

বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো ।

ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে

দিকে দিগন্তরে,

বর্ষে বর্ষে

তুণে শস্তে পুষ্পে পর্ণে,

পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,

চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে ।

অভাব যেখানে এই মন-ভোলাবার

সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার ।

এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই—
 তোমরা ভোল না শুধু তুলি আমরাই ।
 এই কথা স্পষ্ট দিচ্ছ করে,
 সৃষ্টি করু নাহি ঘটে একেবারে বিশ্বক্বরে লয়ে ।
 পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে শুরু হয়ে থাকে,
 কারেও কোথাও নাহি ডাকে ।
 অপূর্ণের সাথে ঘন চাকল্যের শক্তি দেয় তারে,
 রসে রূপে বিচিত্র আকারে ।
 এরে নাম দিয়ে মোহ
 যে করে বিদ্রোহ
 এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
 পড়ে থাকে তীরে ।
 পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
 মোহতরী বেয়ে তাই সুখাসাগরের প্রান্তে আসি
 আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
 অসীমের ছায়া ।
 অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
 স্বল্প জানা ভূরি অজানায় ।”

কোনো কথা নাহি ব'লে
 সুন্দরী ফিরায়ে মুখ ক্রত গেল চলে ।
 পরদিন বটের পাতায়
 গুটিকত সত্তফোটা বেলফুল রেখে গেল পায় ।
 বলে গেল, “কমা করো, অবুঝের মতো
 মিছেমিছি বকেছি কত ।”

ঢেলা আমি মেরেছি চৈত্র-ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
 তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে ।
 নিয়ে এই বিবাদের দান
 এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান ।

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
 সকালে বসি চাতালে ।
 অমুকুল অবকাশ ;
 তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
 ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
 পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে ।
 লিগতে বসি,
 কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
 ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস ।

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
 পাশের রেলিংটির উপর ।
 আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
 এখানে আসে না তার বেদরনী শাসনকর্তা বাধন হাতে ।
 বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে বুলে,
 নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
 একটা একলা কুড়চিগাছ
 আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে ।
 প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্য
 ময়ূরটি ঘাড় বাকায় এদিকে ওদিকে ।
 তার উদাসীন দৃষ্টি
 কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায় ;
 করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা ;
 তাহলে নগণ্য মনে করত না কবিকে ।
 হাসি পেল ওর ঐ গভীর উপেক্ষায়,
 ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা ।
 দেখলুম, ময়ূরের চোখের উদাসীন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা-আম-ঝোলা গাছের পাতার পাতায়,
ভেঁতুলগাছের গুহনমুখর মৌচাকে ।
ভাবলুম, মাহেন্দ্রজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি ।
কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে ।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দায় হবে না কমে ।
আর, মাহেন্দ্রজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্তির জোনাকি ।

নিরবধি কাল আর বিপুল পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে ;
ধাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো ।
ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তাহলে পশুদিনের অস্ত্যসংকার এগিয়ে রাখব মাত্র ।

এমনসময় আওয়াজ এল কানে,
“দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি ।”
ঐ এসেছে— ময়ূর না,
ঘরে ঘর নাম স্নানয়নী,
আমি যাকে ডাকি স্নানয়নী বলে ।
ওকে আমার কবিতা শোনার দাবি সকলের আগে ।

আমি বললেম, “স্বরসিকে, খুশি হবে না,
এ গল্পকাব্য।”

কপালে ক্রকুৎসনের চেউ খেলিয়ে
বললে, “আচ্ছা, তাই সই।”
সঙ্গে একটু স্তম্ভিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, “তোমার কণ্ঠস্বরে
গঞ্জে রঙ ধরে পঞ্জে।”

ব’লে গলা ধরলে জড়িয়ে।

আমি বললেম, “কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?”
সে বললে, “অকবির মতো হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।”

শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে।
মনে-মনে বললুম, প্রকৃতির ঐদাসীন্ত অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার সুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতার।
সেই কণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য

মাহেন্দ্রজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
 চৈত্রমাসের সকালে মৃদু ঝোড়ুহরে ।
 ষখন দেখলুম অস্থির ব্যগ্রতায়
 হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে ।
 তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম,
 বদল হয়েছে পালের হাওয়া ।
 পূবদিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল ।
 সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি একটি কাঁচা আম
 ছিল আমার সোনার চাবি,
 খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি ;
 আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না

গোড়াকার কথাটা বলি ।
 আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
 পরের ঘর থেকে,
 সেদিন ষে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
 বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে ।
 জীবনের বাধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
 এল অদৃষ্টের বদাগ্রতা ।
 পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
 খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে ।
 কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
 চারদিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে ;
 ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
 ঝাড়ে লগ্ননে ।
 অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
 ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য ।

কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
 আলতা-পরা পারে পায়ে—
 ইদ্রিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দায়ের মাহুষ নয়—
 সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয় ।
 বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
 অগতে এমন কিছু থাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না ।
 বাণি ধামল, বাণী ধামল না—
 আমাদের বধু রইল
 বিশ্বয়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা ।

তার ডাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে ।
 অনেক সংকোচে মর একটু কাছে যেতে চাই,
 তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;
 কিন্তু, ক্রকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলেমাহুষ,
 আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের ।
 তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
 বড়োই হবে বা ছোটোই হবে ।
 তা হোক, কিন্তু এ কথা মানি,
 আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি ।
 মন একান্তই চাইত, শুকে কিছু একটা দিয়ে
 সাঁকো বানিয়ে নিতে ।
 একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
 কতকগুলো রঙিন পুঁথি ;
 ডাবলে, চমক লাগিয়ে দেবে ।
 হেসে উঠল সে ; বলল,
 “এগুলো নিয়ে করব কী ।”
 ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্যাঙ্কেতি
 কোথাও দরদ পায় না,
 লজ্জার ডারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
 দেয় মাথা হেঁট করে ।

কোন বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, শস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ঐ উচ্চাঙ্গনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুয়ো শাক আর লকা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্মেও।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে ধায়
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম ;
ও বলল, “কে বলেছে তোমাকে আনতে।”
আমি বললুম, “কেউ না।”
ঝুড়িঝুড় মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, “এমন ক’রে ফল আনতে হবে না।”
চূপ করে রইলুম।

বয়স বেড়ে গেল।

একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;

তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল ।
স্মান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি ।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে ধসে ধসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর ।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই

[? শান্তিনিকেতন]

৮।৪।৩৯



নাটক ও প্রহসন

চণ্ডালিকা

ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শাদূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছে থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্ম বিহানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্মে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে।

প্রকৃতি। এই-যে, মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায়!

প্রকৃতি। এই-যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল ছপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ, ঠোট মেলে গরমে কাক ধুকছে আমলকিগাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস যিনি কাজে। পুরাণ-কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে; তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁ, মা, তপ করছি তো বটে।

মা। অবাক করলে! কার জন্তে।

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,

বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্।

যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি

নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্ ॥

মা। কিসের ডাক।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'! কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ ?

প্রকৃতি । তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জ্ঞাতেরই ।

মা । জ্ঞাত লুকোস নি ? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী ?

প্রকৃতি । বলেছিলেম । তিনি বললেন, মিথ্যে কথা । তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জ্ঞাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ । তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে । আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি ।

মা । তোর মুখে এ-সব কী শুনছি । তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোনো কাহিনী ।

প্রকৃতি । এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের ।

মা । হাসালি তুই । নতুন জন্ম ! ঘটল কবে ।

প্রকৃতি । সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, কাঁ কাঁ করছে রোদ্দুর । মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়ার জলে । কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর । বললেন, জল দাও । প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে । ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ । বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়ার জল অশুদ্ধ । তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে শিথ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে । প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডুষ জল, যার পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক ।

মা । ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এতবড়ো হল তোর বুকের পাটা ! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম ?

প্রকৃতি । কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল । সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম ।

মা । তোর মুখের কথা সূক্ষ্ম বদলে গেছে যে ! জাহ্নু করেছে তোর কথাকে । কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু ?

প্রকৃতি । সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা । এলেন কেন এই কুয়ারই ধারে । একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা । আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা । এই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন । যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না । তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল

ওহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি
দিনরাত— দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল!

দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সখল।

কালো মেঘ-পানে চেয়ে

এল ধ্যেয়ে

চাতক বিহ্বল—

দাও জল, দাও জল।

ভূমিতলে হারা

উৎসের ধারা

অঙ্ককারে

কারাগারে।

কার সুগভীর বাণী

দিল হানি

কালো শিলাতল—

দাও জল, দাও জল।

মা। কী জানি, বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মস্তরের খেলা আমি বুঝি নে।
আজ তোমার কথা চিনছি নে, কাল তোমার মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-
বদলানো মস্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই
আছি তাকিয়ে। রাজহুয়ারে ছপুয়ের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যান ঘরে,
শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুম্বোতলায়
পথের ধারে।

মা। কার জন্তে।

প্রকৃতি। পথিকের জন্তে।

মা। তোমার কাছে কোন্ পথিক আসবে, পাগলি!

প্রকৃতি। সেই এক পথিক, মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের
সকল পথের সব পথিক। দিনের পর দিন চলে যান, এলেন না তো। কোনো কথা

না বলে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো ; ধু ধু করে সমস্ত দিন, ছ ছ করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষু আমার তৃষ্ণা, ওগো
 তৃষ্ণা আমার বন্ধ জুড়ে।
 আমি ঝঙ্কিবিহীন বৈশাখী দিন,
 সস্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
 ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
 মনকে সূঁচুর শূণ্ণে ধাওয়ায়,
 অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
 যে-ফুল কানন করত আলো
 কালো হয়ে সে শুকাল।
 ঝরনারে কে দিল বাধা—
 তাপের প্রতাপে বাধা
 দুঃখের শিখরচূড়ে ॥

মা। তোর আত্মকেকার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা ক'রে বল।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বৃকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

মা। মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিল তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি।

গান

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
 দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
 দয়া করে দাও ভূলিতে,
 নাই ধূলি মোর অন্তরে ।
 নয়ন তোমার নত করো,
 দলগুলি কাঁপে ধরো ধরো ।
 চরণপরশ দিয়ে দিয়ে,
 ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
 ধরার প্রণাম আমি
 তোমার তরে ।

মা । বাছা, কিছু কিছু বুঝতে পারি তোমার কথা । তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোমার পুঙ্খা, সেবাতেই তোমার রাজত্ব । এক নিমিষে জ্ঞাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই ; ধরা পড়ে, সবাই তারা রাজধানীর অংশ, যদি হঠাৎ স'রে পড়ে ভাগোর পর্দাটা । সুযোগ তোমার তো ঘটেছিল । যুগযুগ বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোমাই এই কুয়োতলায় । মনে পড়ে তো ?

প্রকৃতি । হ্যাঁ, মনে পড়ে ।

মা । কেন গেলি নে রাজার ঘরে । রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল ।

প্রকৃতি । ভুলেছিল না তো কী । ভুলেইছিল যে, আমি মানুষ । পশু মারতে বেরিয়েছিল ; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে ।

মা । তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে । আর, ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে ।

প্রকৃতি । বুঝবে না তুমি বুঝবে না । আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সে'ই আমাকে প্রথম চিনেছে । সে বড়ো আশ্চর্য ।

গান

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
 আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি ।
 তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
 তোমায় প্রণাম শতবার ।

আমি তরুণ অরুণলেখা,
 আমি বিমল জ্যোতির রেখা,

আমি নবীন শ্রামল মেঘে
 প্রথম প্রসাদবৃষ্টি ।

তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার ॥

তাকে চাই, মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি। অশুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব ক'রে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন, বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন ধণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি, মা, আবার তাকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের—পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজের যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধ'রে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ডুষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি।

গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।

পারি যদি অস্তুরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।

দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,

নেবার মাহুষ জানি নে তো কোথায় চলে,

এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।

মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে

গন্ধাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।

আপনি কী স্বর উঠল বেজে

আপনা হতে এসেছে যে,

গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে ॥

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচির, কী হবে, মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে।
আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে ?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। খেত-খন্দ যদি তুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মস্তুর জানিস তুই, সেই মস্তুর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বলিস কী! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি! আগুন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ মানুষ! মস্তুর খাটাব এদের 'পরে? শুনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মস্তুর পড়তে চেয়েছিলি কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু, এরা যে কিছুই করেনা।

প্রকৃতি। আমি আর কোনো ভয় করি নে; ভয় করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়ি। আনতেই হবে তাঁকে, এতবড়ো কথা এত ছোর করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়— এই আশ্চর্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে। আমারি আধো আঁচলে বসবে না?

মা। তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি? তোর কিছুই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিছু থাকবে না আমার। আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্মেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা— জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে?

প্রকৃতি। কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে-ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার ব্যরণ। কোনো ভয় আর নেই আমার— পড়্ তোর মস্তুর, ভিক্ষুকে নিয়ে আর চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সন্মান। এতবড়ো সন্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তাতেই জানি তাতেই জানি
 আমায় যে জন আপন জানে—
 তারি দানে দাবি আমার
 যার অধিকার আমার দানে ।
 যে আমারে চিনতে পারে
 সেই চেনাতেই চিনি তারে,
 একই আলো চেনার পথে
 তার প্রাণে আর আমার প্রাণে
 আপন মনের অঙ্ককারে ঢাকল যারা
 আমি তাদের মধ্যে আপনহারা ।
 ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
 ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
 নয়ন আমার ছুটেছে তার
 আলো-করা মুখের পানে ॥

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই ?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে । এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় । কোনো কথাই শুনব না, মা, শুনব না, শুনব না । শুরু করে দে মস্ত । পারব না দেবি সহিতে ।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল ।

প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ ।

মা। আনন্দ ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ?

প্রকৃতি। হ্যাঁ, সেই ভিক্ষু ।

মা। তুই আমার বুক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি— তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিচ্ছি ।

প্রকৃতি। কিসের পাপ ! যিনি সবাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী ।

মা। ঔঁরা পুণ্যের জ্বারে টেনে আনেন যাহুঁষকে । আমরা মস্তর পড়ে টানি, পশুকে টানে যে-ফাঁসে । আমরা মথন করে তুলি পাক ।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পকোকার হয় না ।

মা। ওগো, তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার ষত, কমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার, মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে-বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সাস্থনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।

ধূলার-পড়া ম্লান কুসুম

পায়ের তলার ধরো।

অপরাধে-ভরা ডালি

নিজ হাতে করো খালি,

তারপরে সেই শূন্য ডালায়

তোমার করুণা ভরো।

তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—

ধরব তোমার ফাঁদে

আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার পুণ্য

করবে তো কলকশূন্য,

ক্ষমায় গেঁথে সকল ক্রটি

গলায় তোমার পরো ॥

মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি!

প্রকৃতি। আমার সাহস! ভেবে দেখ্ তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত—আলো ক'রে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমস্ত সকাল বেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে; এলেন মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রথমে রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্তে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্তে— জল

দাও! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম! নামল সেই ভীকর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিনের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল-যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মস্তুর পড়ে। সহীবে তাঁর সহীবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ-যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পর।

প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না, পড়ছেন মহু ?

পথে শ্রমণের।

বুদ্ধো স্তম্বুদ্ধো করুণামহাশিবো

যোচ্চস্ত স্তম্বুদ্ধ-ঐশানলোচনো।

লোকসু পাপূপকিলেসঘাতকো

বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।

প্রকৃতি। মা, ঐ-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে গুর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বাস প'ড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুক) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন— হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্তের জন্তে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই— চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত-কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্ছে চলে, যাক যাক। যা টেঁকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মুহূর্তের অপমান, বুদ্ধের ভিতরে এই খাচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন? যা বুদ্ধের সব শিরা কামড়ে ধ'রে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাধন, নেই কোনো স্বখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা— ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো— ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয়?

মা। তোর কষ্ট দেখতে পারি নে, প্রকৃতি। ওঠ, তুই। আনবই তাঁকে মহু পড়ে। নিয়ে আসব ধুলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর— 'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মহু জীবনসৃষ্টির আদিকালের। এদের মহু কাঁচা, এই

সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মস্তের টানে খুলবে ওদের মস্তের গাঁঠ। ঠুকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাশ্রে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাক।

মা। পাগলি, তবে কী বলছিস মস্তেরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দূরে— কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মস্তেরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।

আবার আনুক, আবার আনুক, আনুক ফিরে।

রেখে দেব আসন পেতে

হৃদয়েতে,

পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুতীরে।

যায় যদি যাক শৈলশিরে।

আনুক ফিরে, আনুক ফিরে।

লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,

ডাকব উহায়—

আমার স্বপন ওর আগরণ রইবে ঘিরে ॥

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মস্ত পড়িস তাই— পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন।

মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তাকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হল তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মস্ত খাটবে, মা, খাটবে। উড়ে যাবে শুক সাধন, শুকনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজার, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসান্ডাটা পাখি যেমন করে এসে

পড়ে অঙ্ককার আড়িনায়। বুক ছরছর করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে চেউ উঠছে যে-সমুদ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আংকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মস্তের বেগ চ'ড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জলবার জিনিস সমস্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিস কার জন্তে। সে কি তেমনি মাহুষ। কিছুতে কিছু হবে না তার— শেষ পর্যন্তই আশুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মঞ্জিল ডমক গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনাস্তর ;
হুলিল চঞ্চল বন্ধোহিন্দোলে
মিলনস্থপে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বুক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর ছঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়মড় করে লুটোবে ধুলোর, অভভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে?

মা। দেখ্, বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মস্তকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষা পাক।

প্রকৃতি । সেই ভালো, মা, থাক তোমার মন্ত্র । আর কাজ নেই ।—না না না না—
পথ আর কতখানিই বা! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই
বুকের কাছ পর্যন্ত । তারপরে সব দুঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে
দিবে । গভীর রাত্রে এসে পৌঁছবে পথিক, সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব
প্রদীপ, আছে সুধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারি জলে অভিষেক হবে তার—যে শ্রান্ত,
যে তপ্ত, যে কতবিক্ষত । আর-একবার সে চাইবে, জল দাও— আমার হৃদয়সমুদ্রের
জল! আসবে সেইদিন । তোম মন্ত্র চলুক, চলুক ।

গান

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
জ্ঞান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার ।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

মা । এত দেরি হবে জ্ঞানতুম না, বাছা । আমার মন্ত্র শেষ হল বুকি । আমার
প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে ।

প্রকৃতি । ভয় নেই, মা, আর-একটু সয়ে থাক । একটুখানি । বেশি দেরি নেই ।

মা । আঘাত তো পড়েছে, ঔদের চাতুর্যাস্ত তো আরম্ভ হল ।

প্রকৃতি । ঔরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে ।

মা । কী নিষ্ঠুর তুই! সে যে অনেক দূর ।

প্রকৃতি । বহুদূর নয় । সাত দিনের পথ । পনরো দিন তো কেটে গেল ।
এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষবোজন দূর, যা
চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দু হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে ।
আসছে, কাপছে আমার বুক ভূমিকম্পে ।

মা । মস্তের সর্ব অঙ্গ পূর্ণ করেছি, এতে বজ্রপাণি ইস্রকে আনতে পারত টেনে ।
তবু দেরি হচ্ছে । কী মরণাঙ্কিত বুদ্ধিই চলছে । কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে ।

প্রকৃতি । প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লাস্ত
দেবতার ফ্যাক্যাশে মুখের মতো । কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন । তারপরে
কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল— ফুলে-গুঠা কেটে-পড়া প্রকাণ্ড বিষকোড়ার
মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ । সেদিন গেল । পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো

যে, বিদ্যাং খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জলছে আগুন সর্বাঙ্গ ধরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম, এখনি দে তোর মস্ত বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জলছে আগুন। যে-পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোস্ ফোস্ ক'রে তাকে ছোবল মারছে, চলছে ঘনঘন। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে—তুধু হুঃখ হুঃখ হুঃখ, অসীম হুঃখের মূর্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে! তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে; মনে হল, আর সহবে না।

প্রকৃতি। যে হুঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের-হুঃখ-জনের। ভীষণ আগুনে গ'লে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁরা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি— মনে হল দেখলুম, সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাছে, আর আগুন কেবলই গোমরাচ্ছে গর্জাচ্ছে। সপ্তধাতুর কোটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে— প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, হুঃখ নেই— ভাঙছে, জলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে ফুলিক। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল, অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাহুঃখ, হে রক্ত, হে ভয়ংকর,

ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।

হোক জটানিঃসৃত অগ্নিকুঞ্জরম-

দংশনে জর্জর স্বাবর জঙ্গম,

ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-নন ঝন-নন

পিণাক টংকরো ॥

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে।

প্রকৃতি। দেখলুম, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে, গোখলি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দূরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি— তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ?

প্রকৃতি। দিক্ দিক্, কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিলাষ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ করলি তুই ?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই— তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন্ সৃষ্টির সঙ্গে এমন ঘটে— এতবড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত !

মা। এই উৎপাত শাস্ত হবে কতদিনে।

প্রকৃতি। যতদিন না আমার দুঃখ শাস্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে।

মা। তোমার আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যাবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নৌকায় ; দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে ; দেখেছি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা ; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাত্রে, বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত স্বন্দ শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য— দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই ; নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস ?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্নত, ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ, জোনাকি জলছে ডালে ডালে, তলায় শেঙলা-ধরা বেদী— সেইখানে এসেই হঠাৎ চমকে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা ; শুনেছি, ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ডাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তারপরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাত্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি

কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই, মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জ্বোরটা দে ঐ মস্ত্রে।

মা। আর পারছি নে, বাছা। মস্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে— হয়তো টিকবে না। হয়তো বেরিয়ে যাবেন, আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চণ্ডালিনীর মায়ামূর্তি। পারব না সহিতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি, মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শুরু কর তোর বসুন্ধরামস্ত্র, টলতে থাক পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,

জননী বসুন্ধরা।

তবে আমার মানবজন্ম

কেন বঞ্চিত করা।

পবিত্র জানি যে তুমি

পবিত্র জন্মভূমি—

মানবকন্যা আমি যে ধন্যা

প্রাণের পুণ্যে ভরা।

কোন্ স্বর্গের তরে

ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,

রহি তোমার বক্ষ-পরে।

আমি যে তোমারি আছি

নিতান্ত কাছাকাছি—

তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে

হৃদয়প্রাণ-হরা।

মা। যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো?

প্রকৃতি। হয়েছে! কাল ছিল শুক্রাধিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহন-স্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্র

এঁকেছি আঙিনায়। পুঁতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুলি, খালায় রেখেছি ঝালাচন্দন, জালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পূর্বদিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্তি। ষোলোটি সোনালি স্তোত্র ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আঙ্গানের নাচ—প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

প্রকৃতি।

গান

মম কঙ্ক মুকুলদলে এসো

সৌরভ-অমৃতে।

মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো

গৌরবনিশীথে।

এই মূল্যহারা মম শুক্তি,

এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।

মম মৌনী বীণার তারে তারে

এসো সংগীতে।

নব-অরুণের এসো আঙ্গান—

চিররজনীর হোক অবসান, এসো।

এসো শুভশ্রিত শুকতারায়,

এসো শিশির-অশ্রধারায়,

সিন্দূর পরাও উষারে

তব রশ্মিতে।

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ—কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা—আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শুনব মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর-একটু সয়ে থাকো, মা—দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাপছে ধ্বংসরিয়ে, বুক উঠছে গুরুগুরু করে।

মা। আনছে তোমার অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেয়ে ফেললে! ছিঁড়ল বুঝি শিরাগুলো।

প্রকৃতি । অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে । ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথো । ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে ছলছে আমার প্রাণ । ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ— আমার সমস্ত অপমানের চূড়ার তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন । আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে ।

মা । সময় হয়ে আসছে আমার । আর পারছি নে । শিগ্গির দেখ্ তোমার আয়নাটা ।

প্রকৃতি । মা, ভয় হচ্ছে । তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে ? তার পরে কী । শুধু এই আমি ! আর কিছু না ! এতদিনের নিষ্ঠুর ছুঃখ এতেই ভরবে ? শুধু আমি ? কিসের জন্তে এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ ! শেষ কোথায় এর ! শুধু এই আমাতে !

গান

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে ।
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে ।
চেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন আধার—
পার আছে কোন্ দেশে ।
আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিকরদেশে ॥

মা । ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে । আমার আর সঙ্গ হয় না । শিগ্গির আয়নাটা দেখ্ ।

প্রকৃতি । (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা, রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্ , ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোমার মন্ত্র ! এখনি, এখনি । ওরে ও রান্ধুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে কেন ! কী দেখলেম ! ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই স্বদূর স্বর্গের আলো ! কী রান, কী রান্ধ, আত্মপরাভয়ের

কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এস আমার ঘারে! মাথা হেঁট করে এস! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মস্তের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)— ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে— তাই এত দুঃখই পেলে— কমা করো, কমা করো। অসীম মানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো-লাগা। আমার মায়্যা-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।

মা। জয় হোক, প্রভু। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐগানেই— তোমার কন্মার তীরে এসে।

[মৃত্যু

আনন্দ।

বুদ্ধো স্তস্ত্বো করুণামহাগ্ৰবো
যোচ্চন্ত স্ত্বক্কর-ঞানলোচনো।
লোকস্ স পাপূপকিলেসঘাতকো।
বন্দাসি বুদ্ধম্ আহমাদয়েণ তম্।

তাসের দেশ

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিন্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার
পূণ্যত্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ
ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা
উৎসর্গ করলুম।

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো ।
তুমি কবে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ।
শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্ঝন্ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর কলন শকার—
বন্ধন ছর্ব্বার
সহ না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও ।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো
গনি গনি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, ঘাই কি নাহি ঘাই রে ।
সংশয়পারাবার
অস্তরে হবে পার,
উদ্বেগে ভাকায়ো না বাইয়ে ।
যদি মাতে মহাকাল,
উদাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুপ্তিত, চেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুপ্তিত,
ভালে তার দিয়ো তাল,
অয়-অয় অয়গান গাইয়ো ।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ।

তাসের দেশ

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র । আর তো চলছে না, বন্ধু ।

সদাগর । কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার ।

রাজপুত্র । কেমন ক'রে বলব । কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে ।

সদাগর । সেখানে যে ওদের বাসা ।

রাজপুত্র । বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন । না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ ।

সদাগর । তুমি উড়তে চাও ?

রাজপুত্র । চাই বই কি ।

সদাগর । বুঝতেই পারি নে তোমার কথা । আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচার বন্ধ খাকা ও ভালো ।

রাজপুত্র । সকারণ বলছ কেন ।

সদাগর । আমরা-যে সোনার খাঁচার খাঁক শিকলে বাধা দানাপানির লোভে ।

রাজপুত্র । তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না ।

সদাগর । আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি বুঝতেই পারি নে । একটু স্পষ্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল ।

রাজপুত্র । রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো ।

সদাগর । একঘেয়ে বল তাকে ? কতরকম আয়োজন, কত উপকরণ ।

রাজপুত্র । নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা । কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শব্দ কীসর ঘণ্টা । নৈবেদ্যের বাধা বরাদ্দ, কিন্তু ভোগে ক'চি নেই । এ কি সহ্য হয় ।

সদাগর । আমাদের মতো লোকের তো খুবই সহ্য হয় । ভাগ্যিস বাধা বরাদ্দ । বাধন ছিঁড়লেই তো মাথার হাত দিয়ে পড়তে হয় । যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষুধা মেটে । আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষুধা মেটাতে চাও ।

রাজপুত্র । আর, রোজ রোজ ঐ-ষে চারণদের স্তব শুনতে হয় একই বাঁধা ছন্দে—
সেই শাদুলবিক্রীড়িত ।

সদাগর । আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বারবার ষতই শোনা যায় ততই
লাগে ভালো । কিছুতেই পুরোনো হয় না ।

রাজপুত্র । ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল । আর, রোজ সকালে সেই
এক পুরুতঠাকুরের ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ । আর আসতে যেতে দেখি, সেই বুড়ো
কঙ্কীটা কাঠের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে । কোথাও যাবার
জন্তে একটু পা বাড়িয়েছি কি অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে—
ইত ইতো, ইত ইতো, ইত ইতো । সন্ধ্যাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে
রেখেছে ।

সদাগর । কেন, মাঝে মাঝে বখন শিকারে যাও তখন বুনোজন্তু ছাড়া আর-কোনো
উৎপাত তো থাকে না ।

রাজপুত্র । বুনোজন্তু বলো কাকে । আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী
বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে । ওরা যেন অহিংসনীতির দীক্ষা নিয়েছে । এ
পর্ষন্ত একটাকেও তো ভদ্ররকম লাফ মারতে দেখলুম না ।

সদাগর । যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসৌজন্য ব'লে মনে
করি নে । শিকারে যাবার ধুমধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল বুক ছুঁছুঁ করে না ।

রাজপুত্র । সেদিন ভালুকটাকে বহুদূর থেকে ভীর বিঁধেছিলুম, তা নিয়ে চার দিক
থেকে ধনু-ধনু পড়ে গেল ; বললে, রাজপুত্রের লক্ষ্যভেদের কী নৈপুণ্য ! তার পরে
কানাকানিতে শুনলুম, একটা মরা ভালুকের চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে
রেখেছিল । এতবড়ো পরিহাস সহ করতে পারি নি । শিকারীকে কারাদণ্ডের
আদেশ করে দিয়েছি ।

সদাগর । তার উপকার করেছ । তার সে কারাগারটা রানীমার অন্তরমহলের
সংলগ্ন, সে দিব্য স্থখে আছে । এই তো সেদিন, তার জন্ত তিন মন ঘি আর
তেত্রিশটা পাঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে ।

রাজপুত্র । এর অর্থ কী ।

সদাগর । সে ভালুকটার সৃষ্টি যে রানীমারই আদেশে ।

রাজপুত্র । ঐ তো । আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াঝালে । নিরাপদের খাঁচার
থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল । আগাগোড়া সবই অভিনয় । আমাকে
যুবরাজী সঙ বানিয়েছে । আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে । ঐ-ষে

ফগলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্য ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে ।

সদাগর । আর, ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি । রাজপুত্র, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ— মনের আসল কথাটা লুকিয়েছ । ওগো পত্রলেখা, আমাদের রাজপুত্রের গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্নাজ করতে পারবে, একবার স্মৃতিয়ে দেখো-না ।

পত্রলেখার প্রবেশ

গান

পত্রলেখা । গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে—

রাজপুত্র । না না না, রবে না গোপনে ।
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে—

রাজপুত্র । না না না, রবে না গোপনে ।

পত্রলেখা । মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনার আলোক-পিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল ।

হৃদয়শতদল

করিছে টলমল

অরণ্য প্রভাতে করণ তপনে—

রাজপুত্র । না না না, রবে না গোপনে ।

রাজপুত্র । আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দূরের আকাশে । সমুদ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে । সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন করে রেখেছে যাব তারই সন্ধানে ।

গান

যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই ।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই ।

সদাগর । ও কী কথা । বাণিজ্য ? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ ।

রাজপুত্র ।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি

বসিয়ে হাজার দাঁড়ি

কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে

কোন্ সাগরে পাড়ি ।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি

কুল-কিনারা পরিহরি

কোন্ দিকে যে বাইব তরী

বিরাত কালো নীরে —

মরব না আর ব্যর্থ আশায়

সোনার বালুর তীরে ।

সদাগর । অকুলের নাবিকগিরি ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা
নয় । খবর কিছু পেয়েছ কি ।

রাজপুত্র । পেয়েছি বই কি । পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে ।

নীলের কোলে শ্রামল সে দ্বীপ

প্রবাল দিয়ে ঘেরা ।

শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে

সাগরবিহঙ্গেরা ।

নারিকেলের শাখে শাখে

ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে

বইছে নগনদী ।

সাত রাজার ধন মানিক পাবই

সেথায় নামি যদি ॥

সদাগর । তোমার গানের স্বরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক
নয়, এ মানিকের নাম বলো তো ।

রাজপুত্র । নবীনা ! নবীনা !

সদাগর । নবীনা ! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল ।

রাজপুত্র । স্পষ্ট হয়ে রূপ নিতে এখনো দেবি আছে ।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা ।

প্রতিদিনের পথের ধূলায় ষার না চিনা ।

তুনি বাণী ভাসে

বসন্তবাতাসে,

প্রথম আগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা ।

সদাগর । তোমার এ স্বপ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে ।

রাজপুত্র ।

স্বপ্নে দাঁও ধরা

কী কৌতুকে ভরা ।

কোন্ অলকার ফুলে

মালা গাঁথ চূলে,

কোন্ অজানা সুরে

বিজনে বাজাও বীণা ॥

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর । রানীমা, উনি মরীচিকাকে আল ফেলে ধরবেন, উনি রূপকথার দেশের
সন্ধান পেতে চান ।

মা । সে কী কথা । আবার ছেলেমানুষ হতে চাস নাকি ।

রাজপুত্র । হাঁ, মা, বড়োমানুষের স্ববুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে ।

মা । বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব । পাওয়া
জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে । তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে স্বয়োগ
তোমার ঘটে নি ।

রাজপুত্র ।

গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো

যারে নাহি পাই গো ।'

সকল পাওয়ার মাঝে

আমার মনে বেদন বাজে,

'নাই নাই নাই গো ।'

হারিয়ে যেতে হবে,

ফিরিয়ে পাব তবে,

সঙ্ঘাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় আগবে ব'লে,
বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাৰ। তুমি বইতে পারবে না
আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব
না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই
কুলদেবতার পূজা সাজাতে। সঙ্ঘ্যার সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে
দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান

রাজপুত্র।

গান

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কুল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কতু।
অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ ক'রে
অপূর্ব ধন যত—
ভিখারি মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল।

সদাগর। রাজপুত্র, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বল, বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।

রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুরোর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমূহুর্তে।

রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে।—

গান

এলেম নতুন দেশে।

তলায় গেল ভয় তরী, কূলে এলেম ভেসে।

অচিন মনের ভাষা

শোনাতে অপূর্ব কোন্ আশা,

বোনাতে রঙিন স্তোত্র দুঃখস্বখের জাল,

বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,

নতুন বেদনায় কিরব কেঁদে হেসে।

নাম-না-জানা প্রিয়া

নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া

হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে

কাণ্ডনমাসে

বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে,

মাতবে দখিনবার

মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়

চঞ্চলিত এলোকেশে ॥

সদাগর। রাজপুত্র, তোমার গানের স্বরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এদেশে ঘোবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারিদিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিটখিট খিটখিট শব্দে, বোধকরি চৌকুনি নূপুর পরেছে পারে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুত্র। এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলোস। আমরা এসেছি কী করতে— ধসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগুন বেরোর কি না। আমার তো মনে হয়, হুঁ দিতে দিতে দর কুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে জ্বলের নৃত্য।

রাজপুত্র। একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

তাসের দলের প্রবেশ

তাসের কাণ্ডযাত্র

গান

ভোলন নামন,
পিছন সামন,
বায়ে ভাইনে
চাই নে চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্ বাস্ বাস্।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, ওকে বসছে একেবারে অকারণে— ভারি অক্লুত। হা হা হা হা।



শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয়

ছকা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছকা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুত্র। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছকা। অর্থ? অর্থের কী ধরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না? পাগল নাকি তোমরা!

রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চাল চলন দেখে।

রাজপুত্র। কী রকম দেখলে।

ছকা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর। আর, তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্ধাচীন, অজাতশত্রু।

ছকা। গুরুশায়ের হাতে মাল্লু হও নি। কেউ বুঝিয়ে দেয় নি, রাস্তার ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাটা আছে খোঁচা আছে—চলন জিনিসটার আগর বিস্তর।

রাজপুত্র। এ দেশটা তো গুরুশায়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছকা। এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্। আর, বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জাত নেই, গুটি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই।

রাজপুত্র। কিছু নেই, কিছু নেই—সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা?

ছকা। আমরা ভুবনবিখ্যাত ভাসবংশীয়। আমি ছকা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ বারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছকা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো এই ছুরি দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছকা। ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটার প্রথম
যে হাই তুললেন পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো স্নেহভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না বলে
হাইবংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছকা। শুভ গোখুলিলয়ে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাসু রে। ফল হল কী।

ছকা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ ক'রে ইঙ্কাবন, কইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এঁরা
সকলেই প্রণাম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন ?

ছকা। কুলীন বই কি। মুখ্য কুলীন। মুখ থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরজনিনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে
স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে-
সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা। আচ্ছা, তাহলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছকা, হুঁং মন্ত্র প'ড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

তাসের দলের গান

হা-আ-আ-আই।

হাতে কাজ নাই।

দিন যায় দিন যায়।

আয় আয় আয় আয়।

হাতে কাজ নাই।

রাজপুত্র। আর সহ করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।

পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্ত্রটা! অশুচি করে দিলে!

রাজপুত্র। অশুচি ?

পদ্মা। অশুচি নয় তো কী। যন্ত্রের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।

রাজপুত্র। এখন উপায় ?

ছকা। বাছড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাঙবে।

রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।

ছকা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শুচি থাকতে পারবে।

রাজপুত্র। শুচি থাকলে কী হয়।

পদ্মা। কী আর হবে, শুচি থাকলে শুচি হয়। বুঝতে পারছ না ?

রাজপুত্র। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে মল বেঁধে।

ছকা। যুদ্ধ।

রাজপুত্র। তাকে বল যুদ্ধ ?

পদ্মা। নিশ্চয়! অতি বিপুল নিয়মে। তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,

অতি বিপুল, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটু রাগা রাগি না হলে রস থাকে না।

ছকা। আমাদের রাগ বড়ে।

আমাদের যুদ্ধ—

নহে কেহ ক্রুদ্ধ,

ঐ দেখো গোলাম

অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তবু কামান-বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।

পদ্মা। নাহি কোনো অস্ত্র,

খাকি-রাঙা বস্ত্র।

নাহি লোভ,

নাহি কোভ,

নাহি লাফ,

নাহি কাঁপ।

রাজপুত্র । নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকি চাই তো। তাই নিয়েই তো ছুই পক্ষে লড়াই।

ছকা ।

যথারীতি জানি,

সেইমতে মানি,

কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,

কে তোমার টকা, কে তোমার ফকা ।

পঞ্জা । ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল ?

সদাগর । নিশ্চিত । পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্যকে সেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনের ফুলিক। তিনি কামানের মতো আওয়াজ ক'রে হেঁচে ফেললেন— সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি ।

ছকা । এখন বোঝা গেল ! তাই এত চঞ্চল !

রাজপুত্র । স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি ।

পঞ্জা । সেটা তো ভালো নয় ।

সদাগর । কে বলছে ভালো । আদিযুগের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে ।

ছকা । একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি— এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিকতে পারবে না ।

সদাগর । টেকা শক্ত ।

পঞ্জা । তোমাদের বুদ্ধটা কী ধরনের ।

সদাগর । সেটা ছুই ছুই পক্ষের চার চার জোড়া হাঁচির মাপে ।

ছকা । হাঁচির মাপে ? বাস্ রে, তাহলে মাথা ঠোকাঠুকি হবে তো !

সদাগর । হাঁ, একেবারে দমাদম ।

ছকা । তোমাদেরও আদিকবির মন্ত্র আছে তো ?

সদাগর । আছে বইকি ।

গান

হাঁচ্ছোঃ,

ভয় কী দেখাচ্ছ ।

ধরি টিপে টুঁটি,
মুখে মারি মূঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ ॥

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা।
সদাগর। আমরা নাশক, নাগা থেকে উৎপন্ন।
পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শুনি নি।
সদাগর। হাইয়ের বাস্পে তোমরা উড়ে গেছ উচ্ছে, পরলোকের পারে; ইাচির
চোটে আমরা পড়েছি নিচে, এই ইহলোকের ধারে।
ছক্কা। পিতামহের নাগিকার অসংঘমবশতই তোমরা এমন অদ্ভুত।
রাজপুত্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অদ্ভুত।

গান

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্জার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কুল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত ॥

ছক্কা-পঞ্জা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।
রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।
ছক্কা। কিন্তু, নিয়ম!
রাজপুত্র। বেড়ার নিয়ম ডাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে
এগোব কী করে।
পঞ্জা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অগ্নানমুখে ব'লে বসল, এগোব।

রাজপুত্র । নইলে চলা কিসের জন্তে ।
ছকা । চলা ! চলবে কেন তুমি ! চলবে নিয়ম ।

গান

চলো নিয়ম-মতে ।
দূরে থাকিয়ে নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ে নাকো,
চলো সমান পথে ।

রাজপুত্র । হেরো অরণ্য ওই,
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল বরনাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে ।

তাসের দল । ওদিকে চেয়ো না চেয়ো না,
ষেয়ো না যেয়ো না—
চলো সমান পথে ।

পদ্মা । আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবাবি । এইখানে
আজ সভা । এই নাও ভূঁইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে ।

রাজপুত্র । ভূঁইকুমড়োর ডাল ? হা হা হা হা— কেন ।

পদ্মা । চূপ । হেসো না, নিয়ম । বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার
বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ে না ।

রাজপুত্র । কেন ।

ছকা । নিয়ম ।

রাজা রানী টেকা গোলাম প্রভৃতির
যথারীতি যথাভঙ্গীতে প্রবেশ

রাজপুত্র । ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খুশি করে দিই । তুমি ভূঁইকুমড়োর
ডালটা দোলাও ।

গান

জয় জয় তামবংশ-অবতংস,
উদ্রাতীরনিবাসী,
সব-অবকাশ ধংস ।

ভাসৈর দল । ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্ষর !
 রাজা । শাস্ত হও, এরা কারা ।
 ছকা । বিদেশী ।
 রাজা । বিদেশী ! তাহলে নিয়ম খাটবে না । একবার সকলে ঠাই বদল করে
 নাও, তাহলেই দোষ ধাবে কেটে । সর্বাগ্রে ভাসমহাসভার জাতীয় সংগীত ।
 সকলে ।

গান

চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন—

অতি সনাতন ছন্দে

করতেছে নর্তন

চিঁড়েতন হর্তন ।

কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে,

কেউ বা একটু নাহি নড়ে,

কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে

করে কালকর্তন ।

নাহি কহে কথা কিছু,

একটু না হাসে,

সামনে যে আসে

চলে তারি পিছু পিছু ।

বাঁধা তার পুরাতন চালটা,

নাই কোনো উলটা-পালটা,

নাই পরিবর্তন ॥

রাজা । ওহে বিদেশী ।

রাজপুত্র । কী রাজাসাহেব ।

রাজা । কে তুমি ।

রাজপুত্র । আমি সমুদ্রপারের দূত ।

গোলাম । ভেট এনেছ কী ।

রাজপুত্র । এদেশে সব চেয়ে যা ছলভ, তাই এনেছি ।

গোলাম । সেটা কী শুনি ।

রাজপুত্র । উৎপাত ।

ছকা । শুনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শুনলে ? লোকটা এগোতে চার,

বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা হাসে। দুদিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন স্থির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই।
ইজের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অস্ত্রে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অস্ত্রে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘুচিত্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তাহলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে। সেটা চিন্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তখন
আমাদের পুরুত-ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্যন্ত বলতে শুরু করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না করুন, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে
উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম
অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপর।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার
বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র । এই রাজকুমারীদের কাছে ।

রাজা । আচ্ছা, বলো ।

রাজপুত্র ।

গান

ওগো, শাস্ত পাষণমুরতি স্নন্দরী,

চঞ্চলেবে ছন্দয়তলে লও বরি ।

কুঞ্জবনে এসো একা,

নয়নে অশ্রু দিক দেখা,

অরণ্যরাগে হোক রঞ্জিত

বিকশিত বেদনার মঞ্জরী ।

রানী । এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার !

পঞ্জা । রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন !

রাজা । নির্বাসন ! রানীবাবি, তোমার কী মত । চূপ ক'রে রইলে যে । শুনছ আমার কথা ? একটা উত্তর দাও । কী বল, নির্বাসন তো ?

রানী । না, নির্বাসন নয় ।

টেকাকুমারীরা । (একে একে) না, নির্বাসন নয় ।

রাজা । রানীবাবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে ।

রানী । আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন ।

গোলাম । টেকাকুমারী, বিবিস্নন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ ।

সকলে । কুষ্টি, কুষ্টি, ভাস্করীপের কুষ্টি । বাঁচাও সেই কুষ্টি ।

গোলাম । জারি করো বাধ্যতামূলক আইন ।

রাজা । অর্থাৎ ?

গোলাম । কানমলা মোচড়ের আইন ।

রাজা । বুঝেছি । রানীবাবি, তোমার কী মত । বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই ?

রানী । বাধ্যতামূলক আইন অন্তরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি— দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন ।

টেকাকুমারীরা । (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন ।

গোলাম । এ কী হল । হায় কুষ্টি, হায় কুষ্টি, হায় কুষ্টি ।

রাজা । সভা ভেঙে দিলুম । এখনি সবাই চলে এসো । আর এখানে থাকা নিরাপদ নয় ।

[ভাস্কর দেশের প্রস্থান]

সদাগর । ভাই সাঙাত, এখানে তো আর গছ হচ্ছে না । এরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ । এদের মধ্যে প'ড়ে আমরা স্বল্প মাটি হয়ে যাব ।

রাজপুত্র । ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না । পুতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার কি অসম্ভব করছ না । আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে ।

সদাগর । কিন্তু, এ যে জীবন্তের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন ।

রাজপুত্র । ঐ দিকে চোখ মেলে দেখো দেখি ।

সদাগর । তাই তো, বন্ধু, লেগেছে সমুদ্রপারের ময় । ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেখছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে ।

রাজপুত্র । চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শুনেছে আকাশ থেকে । এ সময়ে বোধহয় আমাদের সঙ্গটা ওর পছন্দ হবে না । চলো, আমরা সরে যাই ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইস্কাবনী । টেকানীর প্রবেশ

টেকানী ।

গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
ষে-নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে ।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে-নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়
সে-নাম মদির হবে-যে বকুলজাগে ।
নাইয় সখীদের মুখে মুখে
সে-নাম দোলা খাবে সকৌতুকে ।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উত্তলা হবে
সে-নাম শুনাইব গানে গানে ॥

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই ভাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেকানী। হাঁ, ভাই ইস্কাবনী, আর দু দিন আগে কে জানত ভাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছী ছী, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো, ভাই, মানুষপনা, এ-ষে অন্যায়। এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি? আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হবহ মানুষের ভঙ্গী। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় ঢী ঢী পড়ে গেছে। ভাসের দেশের নাম ভোবালে।

চিঁড়েতনীর প্রবেশ

চিঁড়েতনী। কী গো টেকাঠাকরন, শুনেছি, আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেকানী। তা, সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ-ষে তোমার গাল দুটি টুকটুক করছে, রঙ্গিনী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ-ষে তোমার ভুরুর ভঙ্গিমা, ধার করেছে কোন্ বিদেশী অমাবস্তার কাঙ্ক্ষলতা থেকে। এটা তো সাতজন্মে ভাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না। তুমি কি ভাব', এ কারো চোখে পড়ে না।

চিঁড়েতনী। মরে যাই! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে কিস্-কিস্ করছ, এটাই কি ভাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না কি। ওদিকে-যে গোলাম বেচারী তার জুড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা, গুরুঠাকরন, উপদেশ দিতে হবে না। চূলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে ভাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি ভাসরমণী হয়ে!

চিঁড়েতনী। তা, হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ-ষে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী বলে টিটকারী দিতে এসেছিল, আমি তাকে পষ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের ভাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বেঁচে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গুমোর কোরো না গো কোরো না— জান? তোমাকে জাতে ঠেলবে বলে কথা উঠেছে।

চিঁড়েতনী। ভাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইন্সাবনী। সর্বনাশ! এমন খাষ্টমির কথা তো সাত জন্মে শুনি নি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই, টেকারানী, কে কোথা থেকে দেখবে, ওর সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমাদের স্বচ্ছ মজাবে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেকার প্রবেশ

হরতনী।

গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।

এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় হু নয়নে ॥

রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

রুইতন। এ কী, হরতনী, তুমি এখানে? খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল যে।

হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই।

রুইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরীবুমণ্ডলে।

হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

রুইতন। হারিয়ে গেছ?

হরতনী। হ্যাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না, কোনোদিনই।

রুইতন। এ কা কাণ্ড। এ কী দুঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না—নিয়ম নেই?

হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা। হঠাৎ সকালে উঠেই বেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।

রুইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে—এতবড়ো অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।

হরতনী । হঠাৎ মনে হল, আমি মালিনী, আর-অগ্নে ফুল তুলতেম । আজ পুবে হাওয়ায় সেই অগ্নের ফুলবাগানের গন্ধ এল । সেই অগ্নের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে ।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে ।
 আমারে কার কথা সে যায় গুনিয়ে ।
 আলোতে কোন্‌ গগনে মাধবী জাগল বনে,
 এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে ।
 সারাদিন সেই কথা সে যায় গুনিয়ে ।
 কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
 কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে ।
 কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
 বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে ।

রুইতন । আচ্ছা, গরীবুগলের অন্তে বিবিস্বন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—

হরতনী । হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলার তলায় ।

রুইতন । কী করছে ।

হরতনী । সাজ বদল করছে, আমারই মতো । কেমন দেখাচ্ছে । পছন্দ হয় ?

রুইতন । মনে হচ্ছে, পর্দা খুলে গেছে, তাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ ।

হরতনী । তোমাদের ছকা পঞ্জা আমাদের শাসাবার অন্তে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও ।

রুইতন । কেন । কী হল ।

হরতনী । খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । দীর্ঘনিখাস ফেলছে, এমন কি গুন্‌গুন্‌ করে গানও করছে ।

রুইতন । গান । ছকা-পঞ্জার গান !

হরতনী । সুরে না হোক, বেসুরে । আমি তখন চুল বাঁধছিলুম । থাকতে পারলুম না, চলে আসতে হল ।

রুইতন । আশ্চর্য করলে । চুল বাঁধা ! এ বিড়ম্ব কে দেখালে ।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনার নামল বর্ষা।
জলের ধারায় ধারায় শুরু হল বেণীবন্ধন। এ বিছা কে দেখাল তাকে। চলো আমার
সঙ্গে, ছকা-পঙ্কার গান শুনিয়ে দিই তোমাকে।

[প্রস্থান

বিবিদের প্রবেশ

বিবিরা।

নাচ ও গান

অজানা স্বর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
বিশ্বত জন্মের ছায়ালোকে
হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
কেন্দ্রে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥

[প্রস্থান

রুইতন-হরতনীর পুনঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে। সে দেখলুম
ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন। দেখো, হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে, কেন কী জানি। একটা
কিছু হুকুম করো, তোমার জন্তে দুঃসাধ্য কিছু একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেলো না, বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও।
ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন। দেখো, সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুকেছি, আমাদের এই ভাগ্যকয়টা
স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই
বাণী আসছে মুখে, তারই গান শুনছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই
যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

গান

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।

যেন আমার গানের তানে
তোমার ভ্রুণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গঁথে দিই প্রাণের অহুরাগে ।

হরতনী । এ গান কোনোদিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই ভ্রুণে ? কেমন
ক'রে বাঁধলে ।

রুইতন । যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী ।

হরতনী । আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো-
একটা যুগে ।

রুইতন । মনে আসছে, আসছে । এতদিন ভুলে ছিলাম কী করে তাই ভাবি ।

গান

উত্তল হাওয়া লাগল আমার গানের তরঙ্গীতে ।

দোলা লাগে, দোলা লাগে

তোমার চঞ্চল ঐ নাচের লহরীতে ।

যদি কাটে রসি,

যদি হাল পড়ে রসি,

যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,

সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,

করি নে ভয়, নেবই তারে নেবই তারে জিতে ॥

রুইতন । দেখো হরতনী, মন ছটফটিয়ে উঠেছে সমরাজের সঙ্গে পালা দিতে ।
আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবি, তুমি পরিবে দিলে আমার কপালে অমৃতিলক,
আমি বেরলুম বন্দিনীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী । কানে
আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে ।

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি ।

দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি ।

চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে

বুকের মধ্যে উঠবে আমার পুরান ছলে,

সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী ।

হরতনী । চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে । দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী ঘেন কালো পাথরের ক্রকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে । ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক । পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে । কী করতে এসেছি এখানে । ছী ছী, কেন আছি এখানে । একী অর্থহীন দিন, কী প্রাণ-হীন রাত্রি । কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে ।

কইতন । সাহস আছে তোমার, সুন্দরী ?

হরতনী । আছে, আছে ।

কইতন । অজানাকে ভয় করবে না ?

হরতনী । না, করব না ।

কইতন । পা যাবে ক্ষতিবিকৃত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না ।

হরতনী । কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে । রাজে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে । আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা ।

কইতন । ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো । মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও ।

[প্রস্থান]

ছক্কা-পঞ্জার প্রবেশ

ছক্কা । ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি ।

পঞ্জা । ভারি লজ্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে । মূঢ়, মূঢ় ! কী করছিলি এতদিন ।

ছক্কা । এতদিন পরে কেন মনে প্রায় আগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী ।

পঞ্জা । ঐ-যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ঠুকে জিজ্ঞাসা করি ।

দহলার প্রবেশ

ছক্কা । এতকাল যে-সব গুঠাপড়া-গোঁড়াবসার কোটকেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী ।

দহলা । চূপ ।

ছক্কা-পঞ্জা । (উভয়ে) করব না চূপ ।

দহলা । ভয় নেই ?

ছক্কা-পঞ্জা । (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী ।

দহলা । অর্ধ নেই— নিয়ম ।

ছক্কা । নিয়ম যদি নাই মানি ?

দহলা । অধঃপাতে যাবে ।

ছক্কা । যাব সেই অধঃপাতেই ।

দহলা । কী করতে ।

পঞ্জা । সেখানে যদি অগৌরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে ।

দহলা । এ কেমন গৌরবের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে !

পঞ্জা । শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি ।

হরতনীর প্রবেশ

দহলা । শুনছ, শ্রীমতী হরতনী ? এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতল-স্পর্শ প্রশান্তমহাসাগরের ধারে ।

হরতনী । আমাদের শান্তিটা বৃড়ো গাছের মতো । পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নিছাঁব, তাকে কেটে ফেলা চাই ।

দহলা । ছী ছী ছী ছী, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল ! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি ; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি ।

হরতনী । অনেকদিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ, পণ্ডিত । আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ে না ।

দহলা । সর্বনাশ ! কার কাছ থেকে পেল এ-সব কথা ।

হরতনী । মনে মনে তাকেই তো ডাকছি । আকাশে শুনতে পাচ্ছি তারই গান ।

দহলা । সর্বনাশ । আকাশে গান ! এবার মজল তাসের দেশ । আর এখানে নয় ।

[প্রস্থান

ছক্কা । সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও ।

পঞ্জা । অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের ।

হরতনী । বিধাতার ধিকারের মধ্যে আছি আমরা, মৃত্যুর অপমানে । চলো, বেরিয়ে পড়ি ।

ছক্কা । একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি' ।

হরতনী । দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই ।

[প্রস্থান

ইস্কাবনী ও টেকানী ফুল তুলছে

টেকানী। ঐ-রে, দহলানী এসেছে। আর রক্ষে নেই।

দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ-যে আমাদের টেকানী। আর, উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?

টেকানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আট বন্ধন— হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, খসে পড়ল? কাণ্ডটা ঘটল কী করে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলো গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাধন ছেঁড়ে! আমাদের পবনদেবের নামে এত বড়ো বন্দনাম। বলি, এ কি মেলোচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একটু হাওয়া দিলেই গাছের শুকনো পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না, দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের পবনদেব!

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন পবনদেব! তবে কিনা পুঁথিতে লিখছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে।

টেকানী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে বুঝি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাগিনীদের বুকে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মানুষরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের পূর্বপুরুষ।

দহলানী। হতে পারে— ওরা লাফ-মারা বংশেরই সম্ভান।

টেকানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো, দিদি— ভিতরে ভিতরে তোমারও মন চঞ্চল হয়েছে? না, চূপ করে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে বলে দিবি নে তো?

টেকানী। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাস্তিরের ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিন্তু—

টেকানী। কিন্তু কী।

দহলানী । সে কথা থাক্ গে ।

ইস্কাবনী । বুঝেছি, বুঝেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপ্নে ।

দহলানী । চূপ চূপ চূপ, নহলাপণ্ডিত শুনলে স্বপ্নেরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে ।
ওটা পাপ যে । কিন্তু, স্বপ্নে কী ফুঁতি ।

টেকানী । যা বলিস, ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে ।
কিছু যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিচ্ছে উড়িয়ে ।

দহলানী । তা হোক, এখনো কিন্তু কিছু উড়ল, কিছু রইল বাকি । মাথার ঘোমটা
যদি বা খসল, পায়ের বাঁক-মল তো সোজা করতে পারল না ।

ইস্কাবনী । সত্যি বলেছিল, মনটা সমুদ্রের এপারে ওপারে দোলাতুলি করছে । ঐ
দেখ-না, চিঁড়েতনীর মানুষ হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মানুষের মুখোষ পরেছে—
সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে তৈরি । কী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে ।

দহলানী । আমাদের কাকে কী রকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে ।
গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুস্তুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ
সাজছে ।

টেকানী । ওমা, কী লজ্জা । রাজপুস্তুর কী বললেন ।

দহলানী । তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই— সাজের ভিতর দিয়ে রুচি
দেখা দিল । তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে
মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সাজে বেড়ায় ।

ইস্কাবনী । ওমা, তাও কি ঘটে নাকি । মানুষ হয়ে তাসের নকল ! আচ্ছা, কী
করে তারা ।

দহলানী । রাজপুস্তুর বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি বুলোয় ঠোঁটে, কালো বাতি
দিয়ে আঁকে ভুরু, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো । সব চেয়ে
মজার কথা, ওরা খুব-ওয়ালো চামড়া লাগায় পায়ের তলায় ।

টেকানী । কেন ।

দহলানী । পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না । এ সমস্তই তাসের ঢঙ । এঁকে
দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা ।

ইস্কাবনী । এ তো দেখি পবনদেবের উলটোপালটা খেলা— তাসীরা হতে চায়
রঙ খসিয়ে মানুষ, মানুষ চায় রঙ মেখে তাসী হতে । আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি,
মানুষের মস্তর নেব রাজপুস্তুরের কাছে ।

টেকানী । আমিও ।

দহলানী । আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয়ও করে । শুনেছি মানুষের দুঃখ ঢের, তাদের কোনো বালাই নেই ।

ইস্কাবনী । দুঃখের কথা বলছিস, ভাই ? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বুকের মধ্যে ।

টেকানী । কিন্তু, সেই দুঃখের নেণা ছাড়তে চাই নে । থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে ।

গান

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অমতন প্রাণের 'পরে ।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥

ইস্কাবনী । পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে । কাগজে যদি রটে যায় তাহলে মুখ দেখাতে পারব না ।

দহলানী । ঐ-যে দলবল সবাই আসছে । বুড়োনিগতলায় আজ সভা বসবে । এখানে আর নয় ।

[প্রস্থান

রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ

রাজা । এ জায়গাটা কেমন ঠেকেছে । ওটা কিসের গন্ধ ।

পঞ্জা । কদম্বের ।

রাজা । কদম্ব ! অদ্ভুত নাম । ওটা কী পাখি ডাকেছে ।

পঞ্জা । শুনেছি, ওকে বলে ঘুঘু ।

রাজা । ঘুঘু ! তাদের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিন্তি ।— আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে । আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে স্বর উঠেছে । অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছি । রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে

বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না— সভ্যর সাজ নেই, অত্যন্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে— সেগুলো রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাঙ্গীর্ষহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বনে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শুনেছি, আধুনিক ডাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইন্ফলুয়েঞ্জা।

রাজা। কী রকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম।

যে দেশে বায়ু না মানে

বাধ্যতামূলক বিধি,

সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি

কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—

সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।

রাজা। থাক, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার ?

রাজপুত্র। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁকি

বিদ্যাংবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,

স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়

বনস্পতির শাখাতে।

শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,

অচিন পথের ছন্দ উড়ায়

মুক্ত বেগের পাখাতে।

অস্তরতল মন্বন করে ছন্দে
 মাদার কালোর ঘন্ডে,
 নানা ভালো নানা মন্দে,
 নানা সোজা নানা বাঁকাতে ।
 ছন্দ নাচিল হোমবহির তরঙ্গে,
 মুক্তিরণের ষোড়্ বীরের ক্রভঙ্গে,
 ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
 রুদ্রপথের চাকাতে ॥

রাজা । কিছু বুঝলে তোমরা ?

তাসের দল । কিছুই না ।

রাজা । তবে ?

তাসের দল । মন মেতে উঠল ।

রাজা । সেটা তো ভালো নয় । আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা

শোনো:—

শান্ত যেই জন
 ষম তারে ঠেলে ঠেলে
 নেড়েচেড়ে যায় ফেলে ;
 বলে, “মোর নাহি প্রয়োজন ।”

শোনো বিদেশী ।

রাজপুত্র । আদেশ করো ।

রাজা । তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্— জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ
 পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ— এ-সব কেন ।

রাজপুত্র । রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ,
 গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন ।

রাজা । সে আমাদের নিয়ম ।

রাজপুত্র । এ আমাদের ইচ্ছে ।

রাজা । ইচ্ছে ? কী সর্বনাশ ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে ! বন্ধুগণ, তোমরা-
 সবাই কী বল ।

ছকা-পঞ্জা । আমরা এর কাছে ইচ্ছেমন্ত নিয়েছি ।

রাজা । কী মন্ত ।

ছকা-পঞ্জা ।

গান

।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে ।

সেই তো আঘাত করছে তালায়,

সেই তো বাঁধন চিঁড়ে পালায়,

বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে ॥

রাজা । যাও, যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও । হরতনী, কানে পৌঁছল না কথাটা ? চিঁড়িতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা ? হঠাৎ এমন হল কেন ।

হরতনী । ইচ্ছে ।

অন্য টেকারা । ইচ্ছে ।

রাজা । ও কী রানীবাবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে ।

রানী । আর বসে থাকতে পারছি নে ।

রাজা । রানীবাবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে ।

রানী । সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে ।

রাজা । জান ? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ ।

রানী । জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস ।

রাজা । শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ ?

রানী । আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে ।

কুইতন । হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় তেলখানাকে বলে শুরবাড়ি ।

রাজা । চূপ ।

হরতনী । এরা হেয়ালিকে বলে শাস্তর ।

রাজা । চূপ ।

হরতনী । বোবাকে বলে মাধু ।

রাজা । চূপ ।

হরতনী । বোকাকে বলে পণ্ডিত ।

রাজা। চূপ।

পদ্মা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা। চূপ।

রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা। রানীবাবি, তোমার বনবাস!

রানী। বাঁচি তাহলে।

রাজা। নির্বাসন!— ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।

রাজা। তবে?

রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা। কোথায়।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে। যাব নির্বাসনে।

রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।

দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।

রাজা। আর, তোমার পুঁথিগুলো?

দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।

রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?

দহলা। আর চলবে না।

সকলে। চলবে না, চলবে না।

রানী। কোথায় গেল সেট মাছুষরা।

রাজপুত্র। এই-যে আছি আমরা।

রানী। মাছুষ হতে পারব আমরা?

রাজপুত্র। পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা। ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।

রাজপুত্র। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান

বাধ ভেঙে দাও, বাধ ভেঙে দাও,

বাধ ভেঙে দাও ।

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও ।

শুকনো গাঙে আনুক

জীবনের বহুর উদ্যম কোতুক ;

ভাঙনের জয়গান গাও ।

আঁর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,

যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক ।

আমরা শুনেছি ঐ

মার্টৈভ: মার্টৈভ: মার্টৈভ:

কোন্ নৃতনেরি ডাক ।

ভয় করি না অজানারে,

রুহু তাহারি দ্বারে

হৃদাড় বেগে ধাও ।

শান্তিনিকেতন

১৪।১।৩২

উপন্যাস ও গল্প

গল্পশুভ্

গল্পগুচ্ছ

হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অহুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিপুল অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লুপ্তও করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যালীলা জন্মিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মন্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল; তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেরও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককালে বড়োমাহুবি চাল। যে-সমাজ তাঁহার সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। স্মৃতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্বব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ঝব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনাচেষ্ঠায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শত্রু এবং খাঁটি লোককে যেন চুষকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্তই এমন অক্ষয় মাহুষকে চায় যে-লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাছে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান-বৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিখাস লইলে বাবুর নিখাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোবাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্তায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজগৎ ডাক দিয়া অল্প ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই সকল ভুরি ভুরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাশঙ্কিত করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অমুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সূচিকণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকালের উপর কোনো প্রকার আক্রমণ নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্ত একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার কল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্রাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। বড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে

বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্তকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কুপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলে ও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হটক চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতর গিন্নিবাগ্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবস্বচ্ছ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে ঐহাদের বিচক্ষণতা আছে তাহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্ত আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপ্ত; নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্বী আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শাস্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা

সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অধাচিত দানে অধাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশ। ভালো। কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈর্ষ্য ভংগনা করিয়া বলে, “তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।”

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মাহুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সম্বল করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ স্বেযোগ নয়; পুরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কতৃৎ নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে, ইহাতে বনোয়ারির যে অস্ববিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জগু তত নহে যতটা পঞ্চণরের ভূগে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জন্মিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের টেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাজে, দক্ষিণা হাওয়ার সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। স্বেধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির

অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঙ্কি-সেবেস্তায় তাহার জ্ঞান জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনার কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বানোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিষটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু, কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বানোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্ষণা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা ঘোবন—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অস্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়াজাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খং লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেরদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম

জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জ্বলে ভিন্ন এলেকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না ; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শান্তির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে ; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আচড়টুকু কাটিতে পারে, এ কথা তিনি বলিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আশ্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্ত কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।”

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্তথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিরই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী।

সুখদা যখন কিরণের কাছে কাগ্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনি। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির ; বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীণকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড় ; জানলার ঠিক পাশেই অস্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লটুকানের রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম - অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্তু ফাল্গুন-ঋতুযাগনের উপযোগী একখানি লটুকানে-

রঙিন চ'দর ও বেলফুলের গড়মালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এতবড়ো কুঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের হুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্ম মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ের মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিশ্বর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্ক যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, “ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপন্ন হইব কেন।” বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, “সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।” সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, “উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।”

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার মিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অস্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অসুধামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাস্তনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাখীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সন্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, “তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!” বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া

চূপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অমুকুল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীক, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নখর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরাম জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার স্নগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংস্ৰভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ স্বেযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অহুচরণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।” সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, “দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।”

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। স্মরণ্যং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর তাঁদের আলোর ঝকঝক করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা

কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অধিক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রে আহাৰ বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধু কৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর ছুঁখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শত্রুর বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বাবাওয়ায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অম্মের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অভ্যস্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, “যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।” কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রভাষ্য বিস্মিত হইয়া কহিল, “শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।”

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বৃষ্টিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আশুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসন্ত্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আগিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। “কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।” স্বরূপ বলিল তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, “এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।”

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিক্রমে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিশ হঠাৎ কাছারিতে আগিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার মকদ্দমার মন্তোরা ঘূষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিশের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাস করা। স্খাবধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা বার্থ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিকিবে কী করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “তুই থাক, তোমার কোনো ভয় নাই।” কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “বনোয়ারি ঘেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।” বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া।

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর

বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের ষড়ার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লটুকানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লঙ্কার ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সম্মান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথায় আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক ছুর্ছু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাঈ যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাঈ, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাউত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগা রাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্য় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখঃখের কতটুকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা কমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হ্রম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইমের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, “এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।” কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, “জান তো, ঠাকুড়পো? তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ

আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।”

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল, তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিশুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়কৃত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইঘণ্টীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে ষথারীতি অস্বাভাবনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জ্ঞান সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্মই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জ্ঞান তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর মেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্য় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যে রূপ কাণ্ড ঘটতেছে তাহাতে কোনদিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানা প্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চূপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন

হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কানী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ তাহা জানে, এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কোশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমেত অমাবস্তা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শাস্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি ঘোবনারস্তের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের মাঝে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎখুঁৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমর ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেমসীকে মগ্নিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুনুকের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের হইতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাণ্ডরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাণ্ড আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌকষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যদিকেই সে ছুটিতে চায় সেইদিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অস্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও কমা করে নাই, কেননা,

এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শাস্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিষমিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটো বউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদবংশের প্রতি যে কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন যঙ্গীর কুপায় কণা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার ছো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, স্বকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ

করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে, যতদিন বাড়ির কর্তা অস্থপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না, এখন গৃহস্থামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর ভয় হইতে পারে, তাহার আত্ম-বিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।’

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্থনা আলোচনা বংশীর সনেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর বসবরহীন ক্ষৌণজীবী ভীকু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে, কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জল হইয়া উঠিল।

এবার কিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সঘন্ডে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ করিয়াছে। স্বামীর সঘন্ডে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই উন্ন, পাছে বনোয়ারির বিধেবদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সম্মানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ

হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং কণ্ডকুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আক্ষালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িমুদ্র লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অহুরাগ। এইজন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্ম বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পাবেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব, তিনি বন্দাদমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

“ওমা! সে কী কথা! এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন!”

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও দীর্ঘা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার খবর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যত্ন মধু, যত কৈবর্ত এবং মুসলমান জোনার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। খবরের কূলে বাতি জালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অস্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দকুঁড় করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অস্তঃপুরে গতিবিধি আছে, স্তরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ খবরের শোকে ক্রমে ক্রমে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পকুঁড় কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, “তুমি এখন আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!”

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, “বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।”

কিরণ মনে মনে কহিল, ‘দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মাহুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।’

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দখ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে ধামিতে চায় না। সে চলিয়া

যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, ‘নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।’

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অস্ত্রপুয়ের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ক্রটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিল না যে, কতাব বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্স চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্স তাড়াবাধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাপাতলার বাধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনয়, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নয়তার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, “কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—”

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, “আমি তাহার কী জানি।”

নীলকণ্ঠ কহিল, “সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।”

‘মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।’ বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, “যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ে না।”

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আশনার মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী

ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, ‘এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।’

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার স্নমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, “জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।”

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অন্তঃপ্রবাহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। ‘আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।’

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটা বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, ‘নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।’ তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বীর সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসন্ত্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিগাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, “তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?”

নীলকণ্ঠ বলিল, “আজ্ঞা, হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।”

বনোয়ারি। আমার ক্রমালে-বাঁধা কাগজগুলো তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমাহুষের মতো কহিল, “আজ্ঞা, না।”

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখন ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদ্বিষ্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগুলি পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্মত নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধাবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছটফট করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বৃষ্টিতে পারিল না, কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলা দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল— হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার ঘাছা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির ক্রমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন ক্রমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই ক্রমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজগুই অগ্নিদাহের গোলমালে ভুতোরায় যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই ক্রমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝবু ঝবু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে

পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শাস্তি করিবার জন্য তাহাকে বারবার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, “হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল।”

হরিদাস কহিল, “আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।”

বনোয়ারি কহিল, “আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।”

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কয়লাখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্ভিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, “নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও— উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।”

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, “আমাকে আর ভয় করিয়ে না, আমি ফেলিয়া দিব না।”

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, “এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ে।”

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, “তুমি কোথা হইতে পাইলে।”

বনোয়ারি কহিল, “আমি চুরি করিয়াছিলাম।”

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, “এই নে বাবা, তোমার জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোমার লোভ পড়িয়াছে, এই নে।” বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তরী এখন তো তরী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরশতকের কবিতাগুলোও বনোয়ারির অল্প সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রদ্ধা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশহৃদয় লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

বৈশাখ, ১৩২১

হৈমন্তী

কন্য়ার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহসম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ-এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজ্ঞাপতির দুই পক্ষ, কন্য়াপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নবমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুন কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা ঘেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেকস্টবুক-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কম বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলার শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুক্তবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অটুহাস্তে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার-যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো। জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হটক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্বেষী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্বা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্তরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অকটাও বড়ো। শিশির আমার খণ্ডরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কণ্ডার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার খণ্ডের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার খণ্ডের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে যোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের যোলো, সমাজের যোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জ্ঞান সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, “এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।”

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, স্ত্রীরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবড়জবড় জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নিচে দুখানি খালি পা।

পর্টের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, খণ্ডের

দুটি আর মেলে না। ওদিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার শানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকুক।

বিবাহসভায় চারি দিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্টার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।’ কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি ঘেন মিতা। তাঁহার গান্ধীর্ষের শিখরদেশে একটি স্থির হস্ত শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রসবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সত্তেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক’টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য ঘেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।”

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিলো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।”

তাঁহার পরে শশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাঙ্গিলেন; বলিলেন, “বুড়ি চলিলাম। তোমার একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্ত দায়ী নই।”

মেয়ে বলিল, “তাই বই-কি। কোথাও একটু যাদ লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।”

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে-সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহাঃসম্বন্ধে আমার শশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; শুটিকয়েক

অপখ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি— বাপকে সেই-সমস্ত প্রলোভন হইতে ষথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল, “বাবা, তুমি আমার কথা রেখো— রাখবে?”

বাবা হাসিয়া কহিলেন, “মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জ্ঞ। অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।”

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনি। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, “সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।”

তিনি বলিলেন, “ঘাছা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।”

সব শেষে আমাকে নিভূতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, “আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।”

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রশ্ন করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্ত সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে ক্রমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে

একেবারে এক গ্রামে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বুঝিয়াছিলাম, দানের মন্ত্বে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আয়তুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির— না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া— তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে ধৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শশুরের চাকরি। ব্যাধি যে তাহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অরূপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নিচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমন বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে

দিতেন না, তবু তাহার জাত সঘন্থে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে শ্বশুর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সঘন্থে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রী-গোছের একটা-কিছু। শ্বশুর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে গুঁচ। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস-উপলক্ষ্য দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অক্ষুট হইতে ক্ষুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, “পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।”

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, “আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।”

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, “ওমা, সে কি কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাস্তুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালকুটি খাইয়া মানুষ, তাই এমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

দিদিমারা বলিলেন, “বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।”

মা বলিলেন, “আমরা যে কুঠি দেখিলাম।”

কথাটা সত্য। কিন্তু কোণীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, “কুঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।”

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।”

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না; বলিল, “সতেরো।”

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি জান না।”

হৈম কহিল, “আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।”

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধুর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, “তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগার।”

হৈম চমকিয়া কহিল, “বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।”

মা কহিলেন, “অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে ‘কখনো না’!” এই বলিয়া আর-একবার চোপ টিপিলেন!

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, “বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।”

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, “তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?”

হৈম বলিল, “আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।”

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধুর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, “আইবড়ো মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।”

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।”

বাবা বলিলেন, “মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিও ‘আমি জানি না, আমার শাণ্ডি জানেন।’”

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে

চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাহার সহপাঠ্যটাই একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, ‘আমি ইহাদিগকে চিনি না।’

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জগ্ন কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আন্তে আন্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, “হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাধনে বাঁধা।”

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অমুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জগ্ন নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, “মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।”

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মামুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেবি নাই।”

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ করিয়াছে। একদিনের জগ্ন কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আপনারা জানেন— সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে ?”

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পাড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার স্বপ্নের ব্রাহ্মণ ও নন, খৃষ্টান ও নন, হরতো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্ম দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।”

অস্তুপুর্বে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গল্পনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতো পাইতাম। একদিনের জন্মও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্ম নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে স্বপ্নেরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, স্বপ্নেরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্ম মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্ম? বাপই ঘেন সব, আমরা কি কেহ নই।” এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, “তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে ঘাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।”

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, “এইবার অপূর্ণ মাথা খাওয়া হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।”

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স গতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রক্তে, রক্তে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি. এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে-অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি বাস্তবিক হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্চিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলো ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অস্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চূপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই!

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুঁ হুঁ করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্রের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করি।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আশ্রয়, না অভ্যাগ, না কিছু। হৈম-যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও

তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদেরকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তরে বাহরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মাহুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আনন্দে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্মই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মাটিচেনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না— কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাগ আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, “বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।”

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।”

হৈম বলিল, “অসুখ তো নাই।”

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাগবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, “আঁ্যা, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোরা! অসুখ করে নাই তো?”

হৈম কহিল, “না।”

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শরীর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অঙ্গ চাপিয়া

নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা পর্বস্ত করিলেন না ‘কেমন আছিস’। আমার শব্দর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি?”

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, “যাব।”

বাপ বলিলেন, “আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।”

শব্দর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই कहিলেন না। আমার শব্দরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অগ্ৰথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, “বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—”

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অগ্ৰায় অপবাদ!

শব্দরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, “বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যিক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।”

বাবা হাসিয়া कहিলেন, “হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।”

আমার শব্দর कहিলেন, “জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উহার কথাটা কি—”

বাবা कहিলেন, “অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব যোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!”

এই কথাটা শুনিয়া আমার শব্দর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল,

তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, “হৈমকে আমি লইয়া যাইব।”

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, “বটে বে—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

বকুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্কা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অশোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্নের জ্ঞান স্ত্রীপরিভ্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিভায় কন্যায় আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুই-জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভৎসনা করিয়া বলিল, “বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জ্ঞান এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।”

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, “ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি মন্ধে করিয়াই আসিব।”

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জ্ঞানও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে-কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ— থাক আর কাজ কী!

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

২৩/১৬

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকস্বপ্ন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্ম লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটার ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জ্বারে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিকে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভূতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার খেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছবার দিকে আমার কোনো লক্ষই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এই জন্ম পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়টার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতে-

ছিলাম। তাহার চিকণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দোখরা ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দক্ষিণ দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুই-চার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল, “আমার ঠাকুরকে দিলাম।”— বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না। ব্যাপারটা নিতাস্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহস্র-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল; সকালের রৌদ্রটি পূর্বের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটাকে জানি না; অন্তমনস্ক হইয়া বলিলাম, “আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।”

বোষ্টমী পায়ের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখহুটি যেন কোন্ দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, “এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন।

তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।”

বুঝিলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সন্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকালের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুকুণ থামিয়া সে বলিল, “গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।”

আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, “উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চূপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।”

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া ‘গৌর গৌর’ বলিয়া উঠিল। কহিল, “ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।”

আমি বলিলাম, “চূপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।”

বোষ্টমী কহিল, “সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।”

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধুলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধুধু করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম, বোষ্টমী সেই ভোয়ের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্ব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তদ্ভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের বৌদ্ধিটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া

বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের স্বর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, “কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।”

আমি বলিলাম, “সে কী কথা।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।”

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অহুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার কচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিশ্বয়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, “যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব, তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।”

আমি বলিলাম, “লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।”

সে বলিল, “আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।”

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার চলে কী করিয়া।”

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্ত কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলা তো।”

শহরে থাকিতে এ প্রসঙ্গ উঠিলে সহজে ছাড়তাম না। ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জগৎগায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিচার সমস্ত বাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চূপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, “না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।”

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্ন তঁাহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতোছ।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখনকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে-পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহার কিছুই দেয় না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, “এই-সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।”

এই বকমের সব উচ্চদের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্তরে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, “তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাহারই পূজা করা হয়। এই তো?”

আমি কহিলাম, “হাঁ।”

সে বলিল, “উহার যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তঁাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।”

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে—সত্য বে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তঁাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি।

কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের ছই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, “তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখন আসি দেখিতে পাই, লেখা লইয়াই আছ!”

আমি বলিলাম, “যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।”

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অর্ধৈর্ষ হইয়া উঠে। আমার সন্ধে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেক মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত ছোড় করিয়া সে বলিল, “গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই— সে কী ঠাণ্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।”

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী ঘেন ব্যধিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।”

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, “তুমি চাহিয়া দেখো না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।”

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, “আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।”

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার

বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, “আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, ‘পাগলি, কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।’ হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?”

কেবল এক মুহূর্তের জ্ঞান মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালির ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, “বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।”

আমি বলিলাম, “আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।”

বোষ্টমী কহিল, “মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিকিবে না।”

আমি বলিলাম, “মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জ্ঞান এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।”

বোষ্টমী কহিল, “দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পৰ্বন্তু যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।”

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অন্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাহার বুদ্ধিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুদ্ধিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাহার চাষবাস অমিত্রমার কাছে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকগান করেন নাই। কেননা, তাহার

লোভ অর। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার খণ্ডর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল খামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোনু বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্ত সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি ষড়্‌ করিতে শিখি নাই, পাড়ার সহী-সাতাতিদের সঙ্গে মিলবার জন্তই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্ত ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন

বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্ম ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়ানিয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, “আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।” তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন বুদ্ধিত, সুরোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্ম ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্ম সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, “বাছা, ছেলেকে দেখিয়ে, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।”

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সীতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীনকালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়া-ছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সীতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, “মা।” ফিরিয়া দেখি,

খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।” নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়েব কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে ‘মা’ বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাঁজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্ধামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল গহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সাস্তনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অমুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন; এমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অত্যাশ্রিত ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন

লইয়া ডুবিয়া তবে সাধনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিদ্ধা আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্ম তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাখিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সেদিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্ম গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্ম তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্ধামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝোপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল

হইয়া আলুখালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্বকিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহাৰ করিতে আসিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “আন্দী নাই কেন।”

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি, এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার অগ্নি বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নিচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ে তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াছে ; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ে কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, “আর আমি সংসার করিব না।”

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, “আমার মাথার দিব্য, তুমি অগ্নি স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।”

স্বামী কহিলেন, “তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।”

আমি বলিলাম, “গুরুঠাকুর।”

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; “গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।”

আমি বলিলাম, “আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখন বলিলেন।”

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন আদেশ কেন করিলেন।”

আমি বলিলাম, “জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।”

স্বামী বলিলেন, “সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।”

আমি বলিলাম, “হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।”

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরশা হইল তিনি বলিলেন, “চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।”

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, “তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।”

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব-চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্বন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এগেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিধ্যপাতিক হয়ে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, “মৃগাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?” চুরিবিছাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পয়েই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা গেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্রাকুরা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালুকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কৌ হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বালা দেশে পিলে যকুৎ অল্পশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না—তারা আপনি এসে চেপে ধবে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক ছুঁছুঁ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়ারগানের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বৃকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের ষত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়ারগানে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্তে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্তে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের ষতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে ছবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্তরমহলের পাঁচিল গুঁঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি

আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোকু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোকুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়ারগায়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোকু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলাম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোকুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ভাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টোটা পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিটমিট করে জলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো— অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অগ্নাশ্ব বলে মনে হয় না। সেই জগ্রে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে

দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো ; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে ।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি । আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না । জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে ? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে । সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সহ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম । বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায় । কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী । মরতে লজ্জা হয় ; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্মে উদয় হয়েই অস্ত গেল । আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোকবাহুর নিয়ে পড়লুম । জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত ; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না । কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশখগাছের অঙ্কুর বের করে ; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঞ্জর বিদীর্ণ হয়ে যায় । আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল ; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল ।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ । আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলা— দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্মেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোন্‌র বেঁধে দাঁড়াল । পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কতবড়ো অপমান । দায়ের প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায় ।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা । তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন । কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন । এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না । তিনি পতিব্রতা ।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল । দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরাই এমনি মোটারকমের

ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ গরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না— রূপও না, টাকাও না। আমার শশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে মেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড় খাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, “মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি পেতে বসলেন।” আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজের ঘে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অনায়াস হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজোটার জন্মেই লোকে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়ততো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে

একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শুরু, সেইজগ্রে আস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়ততো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সহিবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লঙ্কাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না— মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি— এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুলী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, “দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।” যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম,

সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে 'রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্তরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্র যেদিন আগা-গোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরবত্ত্ব করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্মে খুঁংখুঁং-খিটখিটের অস্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাকামার লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিশের পোষা মেয়েচর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ীর দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্মে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের খালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই

দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই স্ববুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজ্ঞাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, “বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।”

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, “দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।”

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ‘বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি, তোর বর ভালো।’

বিন্দু বললে, “বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।”

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর খামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্তে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে— কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, “দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।”

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্ধামি জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে “দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।”

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, “জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।”

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বললুম, বিন্দুর বিবাহের জন্তে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চূপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্তে তোমরা তাঁকে ক্ষমা করো।

ধাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, “দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতাস্তই ত্যাগ করলে?”

আমি বললুম, “না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।”

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা ধাবার জন্তে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলার কয়লা-রাখবার ঘরের এক পাশে বাগ করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

“সত্যি বলছিস, বিন্দি?”

“এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। স্বপ্নের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে ঘরের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।”

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ‘ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।’

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাতে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী খালানুহু ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার খালা চুরি করে রানীকে তার নিজের খালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাতে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাতে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাতে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘুণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, “এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।”

তোমরা বললে, “বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।”

আমি বললুম, “ও কখনো মিথ্যা বলে নি।”

তোমরা বললে, “কেমন করে জানলে।”

আমি বললুম, “আমি নিশ্চয় জানি।”

তোমরা ভয় দেখালে, “বিন্দুর স্বপ্নবাড়ির লোকে পুলিশ-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।”

আমি বললুম, “ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।”

তোমরা বললে, “তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।”

আমি বললুম “আমি নিজের গয়না বেচে বা করতে পারি করব।”

তোমরা বললে, “উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।”

এ কথাই জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর খুশরবাড়ি থেকে ওর ভাস্কর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে খানার খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে— কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোক প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিশের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, “তা দিক খানায় খবর!”

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে ভালাবদ্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাস্করের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছি, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শান্তির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, “ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।”

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রীবেশ্যার বাড়িতে নিজের পৌছে দিয়েছে সতীসাক্ষীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্তে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্তে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়ারগেয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সহিতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু

আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো ষত রকমের ভলটিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁহুর মারা, দামোদরের বন্ডায় ছোটো, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি ছবার সে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, “বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।”

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, “আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।”

আমি বললুম, “সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম— কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।”

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?”

আমি বললুম, “বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।”

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর পরে পুলিশের দৃষ্টি আছে— কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের স্বন্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্মে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, “বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে স্বপ্নরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্মে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীকান্তে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, “আমিও যাব।”

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাশান বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের ষাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, “ধেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী ষাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।”

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, “ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব— ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।”

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম “কী, শরৎ? স্ত্রীবিধা হল না বুঝি?”

সে বললে, “না।”

আমি বললুম, “রাজি করতে পারলি নে?”

সে বললে, “আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।”

যাক, শান্তি হল।

দেশছুঁ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, “মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।”

তোমরা বললে, “এ সমস্ত নাটক করা।” তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! ষতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো ষণ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা গাঙ্ঘনা ছিল। যাই হোক-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আগবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাক্ষী বড়ো জ্বালের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এঁ চিঠি সেজন্তে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক-না কেন, সে জ্বালের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্— সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুঁড়ততো জ্বালের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিল বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্ত বুদ্ধবুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মুহূর্তের জন্তে কেন আমি এই অন্তরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার— কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে দ্বিত— আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল— কোথায় যে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় যে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্‌ ছুঁখে কোন্‌ অপমানে মাহুঁষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোয়! তোয় মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাঙ্গের অঙ্ককারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্তু বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিরেছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ ঘাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবান্ধিও তো আমারই মতো মেয়েমাহুঁষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্তে মরতে হয় নি। মীরাবান্ধি তার গানে বলেছিল, ‘ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।’ এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—

মৃগাল।

শ্রাবণ, ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাজ্জে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলি বল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা বলনা করিয়া কত শীতের রাজ্জে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত

গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে, সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল, সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না; এমনি-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পদা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্বিলু করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের স্মনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিরোর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলো সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন ‘হকার’ দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের

দৃষ্টান্তস্বল। আমাদের খেসা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংঘত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলায় মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দস্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ অয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কল্পজনের ঘরে আমাদের যাওয়া আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অপিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অননুয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বৃষ্টিবার আগেও অনেকটা বৃষ্টি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলো চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুদ্ধি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বস্তত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাড়ানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, “অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!” শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ায় উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু

যখন তার ছোটো বোনের কান্না খামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে তুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি ; বলিয়াছি, “উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।”

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি, সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার স্বযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অহুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অহুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্নার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম, বি এল পাশ করা একটি টাটকা মুনসেফের সঙ্গে অহুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্নার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত, সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম, সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন যা খাইয়া আরও চেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অহুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি ; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সং হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম, এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, ‘বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।’ খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের ‘পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেহো বুদ্ধিটা যে আমার

স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেসামত, ইলেকট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গুটতত্ত্ব, এক্সচেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এন্টিমেট প্রভৃতি বিজ্ঞান আসন্ন জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলো কারবার চলিতেছে কোনো-টার কাজের ধারা বিস্তৃত নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর— তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু টিল না দিলে ব্যবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাক্ষুন্দর প্ল্যান এন্টিমেট এবং প্রস্পেক্ট্‌স্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েরই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, “বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।” প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেকদিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তার অঙ্কা পাওয়া কি কম আশ্চর্য!

প্রসন্ন কহিল, “ভাই, আমার এই কথা বইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা’ না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।”

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো, তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে

না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, “কাজ বোঝে এমন লোক আমি চের দেখিয়াছি, দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুঝির জোরেই কিন্তু মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছে। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুঝিতেও তুমি পাকা।”

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকল প্রকার ব্যাবসা পুরানমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, “আমার সম্বল নাই যে।”

সে বলিল, “বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।”

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, “ঠাট্টা নয়, দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।”

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা স্নদের আশা করিত না, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালি, বোতাম, সাবান, যতই আনাই, বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পত্রপালের মতো খরচের আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিজ্ঞা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষের তিসির

ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায় ; কোথায় কত দর ; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত ; মাঠে ইহার দাম কত ; জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত ; চাষানের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্র-পারে চালান করিতে পারিলে এক লক্ষ কত লাভ হওয়া উচিত— কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অমূল্য-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিমূল্য-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লক্ষা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্ন হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ে ধুলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, “মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার সাক্ষর হইলাম।”

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, “যো ফ্রাণি পরিত্যজ্য— মনে আছে তো ? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।”

আমার রোধ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাটা প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাধিয়া ঝাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নিচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই ক্ষেত্রবশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সত্ততা, তার উপরে সূদের লোভ ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্র্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালর রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্র্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অস্বস্তি স্পষ্ট বুদ্ধিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্ন হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা, এ ছাড়া প্রসন্ন মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই ছইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সত্ততা রক্ষা হয়,

কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডুষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরওয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, বেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে; কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্ত সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণ্ডির মেসাদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, “অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।”

আমি বলিলাম, “যেরকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।”

প্রসন্ন কহিল, “যখন হইতে তোমার ভয়সা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে! কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।”

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, “দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুঠি লইয়া চলো।”

সনাতন দত্তর বংশে কুঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানবপ্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্ষরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন

যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নিবুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মকণ ও গন-তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অমুকুল—এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি জ্বীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, “খোলো দেখি।” খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অমুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অমুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো আয়গায় ষাইতে বলিলে সে বলে, “আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।”—এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অমুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার ককণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নিচে কালি পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনাস্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অমুর মুখের উপর একটি শাস্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, “কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোটা দিয়া ষাইব।”

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি কণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তব্ধ দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া

তার কপাল চূষন করিলাম। সে চূপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইল।”

আমি বলিলাম, “আজ আর সময় হইল না।”

সে কহিল, “মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।”

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসন্মোহনের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার ভেতর ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কুল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সহ করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চূষক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নিচে মেঝের উপর চূপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্ত সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটু-খানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল—আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, “বউদিদি এলেন না?”

আমি বলিলাম, “শরীর ভালো নাই।”

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্ষ দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব তুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, “স্ববোধের জন্ম এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে স্ববোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।”

আমি বলিলাম, “অহু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। স্ববোধের দেখা শুনার কোনো ক্রটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ে।”

অহু কহিল, “এই টাকা লইবার জন্ম কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?”

আমি চূপ করিয়া রহিলাম। অহু বলিল, “একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে, স্ববোধের ঘেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অস্তুত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে স্ববোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন, তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।”

আমি কহিলাম, “অহু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।”

শুনিয়া অহু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অহু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উঠলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় স্ববোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, “আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।”

অহু কহিল, “আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।”

আমি কহিলাম, “কোনো মানুষকেই একটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।”

অহু কহিল, “আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।”

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, “সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ে। আর এই পান্নার কণ্ঠটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ে, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।”

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমান নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, খবর ভালো তো?”

আমি বলিলাম, “এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।”

প্রসন্ন কহিল, “কিন্তু—”

আমি বলিলাম, “সে জানি না— যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।”

প্রসন্ন বলিল, “তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।”

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উলটা। টিকার আগুন ধরিতে সমস্ত লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন ছু করিয়া ধরে। আমি একথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু— কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ

তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু স্ববোধের কী একরকমের ভাব, উহাকে প্রসন্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। স্ববোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না— তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই স্ববোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কামা। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্তরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। স্ববোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল— সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলোকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি— সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ক্রটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে খতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি

করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। স্ববোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। স্ববোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অল্প তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে স্ববোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, স্ববোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারও শাস্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাণ্ডাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম “স্ববোধকে ডাকিয়া দাও।”

সে বলিল, “স্ববোধ শুইয়া আছে।”

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, “শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!”

স্ববোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, “প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।”

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া স্ববোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, স্ববোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধরা দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাবার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই স্ববোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার টিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে

চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে—সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়—চলিবার সময় ঘেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, অন্যকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চূপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, “বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।” যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, “সে হচ্ছে তুমি, আলশ্রমহাসাগর।” পারংপক্ষে সুবোধ কোনো দিন আমার কাছে কাঁদে না, কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝঝঝ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিক্রম তার মর্মে গিয়া বাঞ্ছিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অগ্রায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, “টাকা পাই নাই।”

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল ‘টাকা পাই নাই’। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে—কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালোমামুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সম্ভান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, “টাকা বাহির করিয়া দে।”

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, “না, দিব না, তুমি কী করিতে পার করো।”

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি

ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাংড়াইতে গিয়া দেখি, আজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম— আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোটার সেই চন্দনের ফোটা। স্ববোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্তায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অমুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম! এ কী করিলাম! ভগবান আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্ম না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পুলিশ খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াসু করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; স্ববোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

স্ববোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম, কী স্নন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, “আয়, বাবা স্ববোধ, আয় আমার কোলে আয়!”

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না ; ভাবিল, আমি বিক্রপ করিতেছি । ফ্যান্স-ফ্যান্স করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মুর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ।

মুহূর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল । আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম । কঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না । ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম ।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । বলিলেন, “এ যে একেবারে ক্রান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে । কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল ।”

আমি বলিলাম, “আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ।”

তিনি বলিলেন, “এ তো একদিনের কাজ নয় । বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্রম চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই ।”

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন । বলিলেন, “বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে । বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে ।”

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম । স্ববোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম । ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই । স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম । সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, “এইটি তুমি রাখো ।” বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম ।

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না । উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি । যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না । শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল ।

শেষের রাত্রি

“মাসি !”

“ঘুমোও, ঘটীন, রাত হল যে ।”

“হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই । আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—”

“সীতারামপুরে ।”

“হাঁ সীতারামপুরে । সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে । ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয় ।”

“শোনো একবার ! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন ।”

“ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—”

“তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে । সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির ।”

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল, সে কথা বলা আবশ্যিক । মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো ।

“বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি ? তোমার জাঠততো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন ।

“হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন । তাই ভাবছি—”

“বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন ।”

“ভাবছি, আমি যাব । আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে ।”

“সে কী কথা, ঘটীনকে একলা ফেলে যাবে ? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো ?”

“ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—”

“তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে ।”

“আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে— শুনেছি, ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—”

“তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে । কিন্তু ঘটীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি ।”

“তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—”

“তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।”

“আচ্ছা, বেশ— তুমি লিখো না। আমি ঠকে গিয়ে বললেই উনি—”

“দেখো, বউ, অনেক গয়েছি— কিন্তু এই নিরে যদি তুমি ষতীনের কাছে যাও, কিছুতেই সহিব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোগাতে পারবে না।”

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মনি খানিকক্ষণের অন্ত রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সহি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি সহি, গোসা কেন।”

“দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন— এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।”

“ওমা, সে কী কথা, যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শুবছে।”

“আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চূপ চাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক’রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি!”

“তুমি ধন্নি মেয়েমানুষ যা হোক।”

“তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব’লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।”

“তা, কী করবে শুনি।”

“আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।”

“ইস, তেজ দেখে আর বাঁচি নে। চললুম, আমার কাজ আছে।”

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মনি কাঁদিয়াছে— এই খবরে ষতীন বিচলিত হইয়া বাগিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, “মাসি, এই জানলাটা আর-একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।”

জানলা খুলিতেই শুষ্ক রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে

চূপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা— সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্তু ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চূপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু দেখো—”

“না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম— সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়!”

“মাসি!”

“যতীন, ঘুমোও, বাবা।”

“আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়ো না মাসি।”

“আচ্ছা, বলো, বাবা।”

“আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম, আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চূপ ক’রে সহ করেছি। তোমরা তখন—”

“না, বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ করেছি।”

“মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—”

“ঠিক কথা, যতীন।”

“সেইজন্তুই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।”

মাসি এ কথাই কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন,

‘বাৰা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ে না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মাহুৰকে একটু কাঁদানো চাই।’ কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীৰ্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন, যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিষটা ঐ তারাগুলির মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।”

মাসি আশ্চর্যে আশ্চর্যে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

“আমি ভাবছি, মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।”

“অল্প বয়স কিসের, যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অস্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে কতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের!”

“মাসি মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—”

“ভাব কেন, যতীন? মন যদি আগে তবে সেই কি কম ভাগ্য!”

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মাহুৰ এল ঘারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোমার ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ॥

“মাসি, ঘড়িতে ক’টা বেজেছে।”

“ন’টা বাজবে।”

“সবে ন’টা? আমি ভাবছিলুম, বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক’টা হবে। সন্ধ্যার পর

থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জগ্রে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।”

“কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কহিতে কহিতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।”

“মনি কি ঘুমিয়েছে।”

“না, সে তোমার জগ্রে মস্তুরির ডালের স্প তৈরি ক’রে তবে ঘুমোতে যায়।”

“বলো কী, মাসি, মনি কি তবে—”

“সেই তো তোমার জগ্রে সব পথি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।”

“আমি ভাবতুম, মনি বুঝি—”

“মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।”

“আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম, তোমারই হাতের তৈরি।”

“কপাল আমার! মনি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মনি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্তকে ক’রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।”

“মনির শরীরটা বুঝি—”

“ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।”

“মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী ক’রে।”

“আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়— ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।”

আকাশের তারাগুলি ঘেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মতো জল্জল্ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লাস্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিখাস ফেলিয়া, একটুখানি উসখুস করিয়া যতীন বলিল, “মাসি, মনি যদি ভ্রুগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—”

“এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।”

“আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া মনিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই ঘন্টা দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মনি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য বাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু পুরুষের বাহা-তাহা তো মেয়েদের বাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়, কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই; বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যা-বেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুকিতে পারিয়াছে, মনি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মনি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল, আজকের রাত্রেই পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনে এমনতরো নিরালো পাঁচ মিনিট আর ক’টাই বা বাকি আছে।

৩

“একি, বউ, কোথাও যাচ্ছ না কি।”

“সীতারামপুরে যাব।”

“সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।”

“অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।”

“লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।”

“টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।”

“তা হোক, ও লোকসান গারে সহিবে— তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।”

“মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।”

“যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।”

“বেশ তো, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব’লে আসছি।”

“না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।”

“তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অনুরোধ— আজ যদি না যাই তো চলবে না।”

“আমি জোড়হাত করছি, বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।”

“তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্তে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।”

“না, তবে থাক— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।”

“মাসি, তুমি এমন ক’রে শাপ দিয়ো না বলছি।”

“ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।”

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন, যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, “এই এক কাণ্ড ক’রে বসেছে।”

“কী হয়েছে। মনি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।”

“গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব’লে কান্না। আমি

বলি, ‘হয়েছে কী, আরও তো দুধ আছে।’ কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ক’রে ঠাণ্ডা ক’রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।”

মণি আসিল না বলিয়া ঘটীনের বুকের মধ্যে ধেমল বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অমৃততাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

“মাসি!”

“কী, বাবা।”

“আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্তে শোক কোরো না।”

“না, বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয়, এ কথা আমি মনে করি নে।”

“মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।”

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া ঘটীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের ছুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার ধেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধু মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীরে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তরু রাত্রি মঙ্গলঘণ্টের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল। ঘটীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, ‘এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল—অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।’

“কষ্ট হচ্ছে, মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার

জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাধা ছিল ; আজ যেন বাধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল । এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি ।”

“পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি, যতীন ।”

“আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গেছে । আমার বাধন-ছেড়া হুঃখের নৌকাটির মতো ।”

“বাবা, একটু বেদনার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে ।”

“আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না ।”

“আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন ।”

“মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না । তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ । তাই বলছিলুম—”

“সে আবার কী কথা । আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল । বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার ।”

“কিন্তু এই বাড়িটা—”

“কিসের বাড়ি আমার ! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না ।”

“মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—”

“সে কি জানি নে, যতীন । তুই এখন ঘুমো ।”

“আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল, মাসি । ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না ।”

“সেজ্ঞে অত ভাবছ কেন, বাছা ।”

“তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—”

“ও কী কথা যতীন । তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব ? আমার এমনি পোড়া মন ? তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে-সুখ নেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ ।”

“কিন্তু, তোমাকেও আমি—”

“দেখ, যতীন, এইবার আমি রাগ করব । তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি ?”

“মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—”

“দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ’রে ছিলি, এ আমার অনেক স্নেহের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ’রে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও— বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমূলুক— যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও— এ-সব বোঝা আমার সইবে না।”

“তোমার ভোগে রুচি নেই— কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—”

“ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—”

“কেন ভোগ করবে না, মাসি।”

“না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।”

যতীন চূপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিশ্বাস হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, স্থখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, ‘এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-ছোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত-বড়োই ফাঁকি।’

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।”

“কম কী দিয়ে যাচ্ছ, বাছা। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক’রে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।”

“আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।”

“এসে ছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে ব’সে ব’সে অনেকক্ষণ বাতাস ক’রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।”

“আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি— নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।”

“বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।”

“না, মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।”

“জানিস, যতীন ? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্তে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।”

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস ; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

“কিন্তু, মাসি, আমি তো জানতুম, মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।”

“মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।”

“তা, ভুল থাক-না। ও তো প্যারিস্ একজিবিশনে পাঠানো হবে না— ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।”

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারী মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

“মাসি, ডাক্তার বুঝি নিচের ঘরে ?”

“হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।”

“কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ঔষধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো, ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক’রে জেগে থাকতে দাও। জান, মাসি ? বৈশাখ-ষাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই ষাদশী আসছে—কাল সেইদিনকার রাত্রে সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্তে ডেকে দাও। চূপ ক’রে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের

বলেছে, আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মাসি, আজ রাতে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে— তাহলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই, এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি। মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভ'রে উঠেছে, আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও— এর পরে আর সময় পাব না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সহিতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।”

“ওরে যতীন, ভেবেছিলুম, আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এখনো বাকি আছে, আজ আর পারছি নে।”

“মণিকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব কালকের রাতের জন্মে যেন—”

“যাচ্ছি, বাবা। শত্ৰু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।”

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, “ওরে, আয়— একবার আয়— আয় বে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।”

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “মণি!”

“না, আমি শত্ৰু। আমাকে ডাকছিলেন?”

“একবার তোর বউঠাকরনকে ডেকে দে।”

“কাকে?”

“বউঠাকরনকে।”

“তিনি তো এখনো ফেরেন নি।”

“কোথায় গেছেন?”

“সীতারামপুরে।”

“আজ গেছেন?”

“না, আজ তিন দিন হল গেছেন।”

কণকালের জন্ম যতীনের সর্বাঙ্গ কিম্বিকিম্ব করিয়া আসিল— সে চোখে অন্ধকার

দেখিল। এতক্ষণ বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, “মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।”

“কোন্ স্বপ্ন।”

“মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্ত দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক’রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।”

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, ‘যতীনের জন্ত মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।’

“মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথর, আমার সমস্ত জীবন ভ’রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে ক’রে মাতুষ করব।”

“বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাবে? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর-না।”

“না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন ক’রে সাজাব।”

“আর বকিস্ নে, যতীন, বকিস্ নে— একটু ঘুমো।”

“তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।”

“ও তো একেলে নাম হল না।”

“না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে— সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।”

“তোমার ঘরে আমি কল্যাণদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।”

“মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর ?— আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?”

“বাছা, আমার যে মেয়ে মানুষের মন, আমিই দুর্বল— সেইজন্মেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।”

“মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আগছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি, তা আমি বুঝেছি।”

“যাই বল, বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।”

“মাসি, একটা গর্ভ আমি করব, আমি সুখের উপরে জ্বরদস্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই— সমস্ত জীবন হাতজোড় ক’রে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি ব’লেই এতদিন এমন ক’রে বসে থাকতে হল— এইবার সত্য হয় তো দয়া করবেন। ও কে ও— মাসি, ও কে।”

“কই, কেউ তো না, যতীন।”

“মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—”

“না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।”

“আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—”

“কিছু না যতীন— ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।”

“দেখুন, আপনি গুর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি ক’রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।”

“না, মাসি, না তুমি যেতে পাবে না।”

“আচ্ছা, বাছা, আমি নাইয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।”

“না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে— শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।”

“আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়ানোর সময় হল—”

“সময় হল ? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে— এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সাহসনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন— বিদায় ক’রে দাও, সব বিদায় ক’রে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি — আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।”

“আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।”

“তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।— মাসি, ডাক্তার গেছে ? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানাঘর উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।”

“আচ্ছা, শোও, বাবা, লম্বীটি, একটু ঘুমোও।”

“না, মাসি, ঘুমোতে বোলো না— ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।”

৫

“বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো— ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।”

“কে এসেছে। স্বপ্ন ?”

“স্বপ্ন নয়, বাবা, মনি এসেছে— তোমার স্বপ্ন এসেছেন।”

“তুমি কে ?”

“চিনতে পারছ না, বাবা, ঐ তো তোমার মনি।”

“মনি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।”

“সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।”

“না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যা, ও শাল ফাঁকি।”

“শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে— ওর মাথার হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর।— অমন ক’রে কাঁদিস্ নে, বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একটুখানি চুপ কর।”

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো বাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফুলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে ষতশতা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা যোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে ইঞ্চি ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্ম শেষপর্ষন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফলুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে গুটিয়া লইয়াছেন। তাহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডুঘণ্ড রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্মই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কণ্ডার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সংপাত্ত। তামাকটুকু পর্বন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝগাট নাই, তাই আমি নিভাস্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্মতা আমার আছে— বস্ত্ত না-মানিবার ক্মতা আমার

নাই। অস্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বর হন তবে এই সুলক্ষণটি স্বরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সখকে আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সখকে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনী কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকা প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাধা হকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাগা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পূর্বেই এম্. এ. পাস করিয়াছি। সামনে ষতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু ধু করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুর্মর্মে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি বল, তবে—”। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ধুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।”

হরিশ আসর জমাইতে অধিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে

উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্বা, তাহার পরে ধনুক-ভাড়া পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আশ্রয়মান স্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য বাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিহুদাদা, আমার পিসুততো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি যোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিহুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “মন নয় ছে! খাঁটি সোনা বটে।”

বিহুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার,’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শঙ্কুনাথবাবু হরিশকে কত বিখ্যাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধারতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চূপ্‌চাপ। যে ছুটি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও

চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শঙ্কুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা ছঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিরা যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শঙ্কুনাথবাবুর চূপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শঙ্কুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাধাবাধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার ধার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বেয় সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অল্প পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেন— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেয়ানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশি, শব্দের কম্বলট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত এক-সঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মতহস্তী দ্বারা সংগীত-সরস্বতীর পদবন দলিত বিদলিত করিয়া, আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহ্বাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, ভাবী স্বস্তরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের আয়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের।

ইহার পরে শঙ্কুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অল্প নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি ঠিকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্তে ও গদগদ বচনে কমর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিব্যক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শঙ্কুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শঙ্কুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

ব্যাপারখানা এই।— সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকাধ শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ধেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-খোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্ত্রাক্রাকে স্বেচ্ছা সঙ্কে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে এবং স্ত্রাক্রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজের বসিয়া আছে।

শঙ্কুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চূপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।”

শঙ্কুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?”

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইন্ধিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

“আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।”

শঙ্কুনাথ বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফেশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারি।

শ্রাক্ষা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।”

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শঙ্কুনাথ সেইটে শ্রাক্ষার হাতে দিয়া বলিলেন, “এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।”

শ্রাক্ষা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।”

শঙ্কুনাথ এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।”

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সন্তোষ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “অনুগ্রহ, যাও তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।”

শঙ্কুনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।”

মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লয়—”

শঙ্কুনাথবাবু বলিলেন, “সেজ্ঞ কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ ধরণের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু, রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শঙ্কুনাথবাবু আমাকে ধাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর ধাইবে কেমন করিয়া।”

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কী বল। বসিয়া ধাইতে দোষ কিছু আছে?”

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহায়ে বসিতে পারিলাম না।

তখন শঙ্কুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, “আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—”

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শঙ্কুনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?”

শঙ্কুনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুইচোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শঙ্কুনাথ কহিলেন, “আমার কন্টার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্টা দিতে পারি না।”

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লগুন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রমনচৌকি ও কম্বল একসঙ্গে বাজিল না এবং অল্পের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহা-নির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আশুন। কন্টার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, ‘দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।’ কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শান্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্টার বাপ বিবাহের

আসন্ন হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সংপাত্রে কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বলাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরষাত্রয়া এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নস্বাদ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাসার ষেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শঙ্কুনাথ বিষম জ্বদ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পনতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্ত নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল।

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিহুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিহুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্কুলিকের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-

একদিন নিরালা ছপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ে শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার স্নগন্ধ আচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে তুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম, সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাধিতে তুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, ‘আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।’ হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, ‘মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।’ মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, ‘কই, কিছুই তো হয় নি, বাবা।’ বাপের এক মেয়ে যে— বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের ঘরে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, ‘বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।’ কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, ‘যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার স্নেহের খবরটা দিয়া আসি গে।’ তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটি-মাত্র মাহুঘ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া ভীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের কুমকুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে যেন সেও এক স্বপ্ন; কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদূরে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাজ জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহার যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, “শিগ্গির চলে যায়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।”

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বৃত্তিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটা-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, ‘এমন তো আর শুনি নাই।’

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অস্বরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্র্যাট্‌কর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লগ্নন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো স্বর, অচেনা কণ্ঠের স্বর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ

তুমি— চঞ্চল কালের কুঁড় হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার টেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতার এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার যুদ্ধে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধূয়া— ‘গাড়িতে জায়গা আছে।’ আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুশাশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো স্বধাময় স্বর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, বাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফাস্ট ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফাস্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। ঘারে ঘারে উকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনসময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না— এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধূয়া— ‘জায়গা আছে।’ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষয় ছনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অথও আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই স্মৃটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে স্মর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স যোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িয়া নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক—রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না—ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই স্মৃধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে ; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত স্মৃধাক্ষয়কে সজীব করিয়া তুলিল ; আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেঁটন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অগ্নান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই ধাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্ত করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই স্টেশন-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শাস্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, “এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।”

সে লোকটি রোধ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু মেয়েটির চলিফুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দুঃখিত, কিন্তু—”

তিনিয়া আমি ‘কুলি কুলি’ করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, “না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যাকথা।”

বলিয়া নাম-লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আদালি-সম্মত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আদালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা

গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় স্তম্ভিত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপতন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্থত— স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী, মা।”

মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা—”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

কী সর্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্মৃতি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল ‘জায়গা আছে’, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধূয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি ? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায় ? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না ; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক, ১৩২১

তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমরাত্রে গুমট গেছে, বাশগাছের পাতাটা পৰ্ব্বস্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্দব্দ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝিঝিঝি করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নিচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কুচ্ছ সাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আঙ্গিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্নমশায় আসেন ; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অস্তুত বি. এ. পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মাহুঘটি শোধিন। জীবননিকুঞ্জের মধুসঙ্ঘের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেত্রাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই নয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আয়ামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে

সিগারেটগুলো সদবেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতমমুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মভেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাস্টারের কাছে সঙ্কান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদগতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যারা পরীক্ষাগাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে-তপস্বী করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্বী, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে ঘোঁষতপস্বী এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্বীর প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মা; তারা বরদাকে বড়ো জালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সাহসনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টার-মশায়দের মধ্য হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর এক দল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফাস্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জ্বালাপের বড়ি খাইল এবং ধনুস্তরীর কুপায় ফেল করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল, এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষায় অন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ, তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটনা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে

সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, “এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।”

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?”

সে বলিল “বিলাতে।”

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপ্নের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেকিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি. এ. পাশ করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি. এ. পাশ না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি. এ. পাশ না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি. এ. পাশ বিদ্যা-পর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথাই ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মূনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি. এ. পাশে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, ‘বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।’ আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমনসময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, ‘দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!’ স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি. এ. পাশের অধীন নয়, এবং যেটাতে দ্বারা স্মৃত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সম্যাসী হওয়া। এই চিন্তা-টার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল, স্থলঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষা-দুর্গের ভগ্নাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের

উপর এক টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

“আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।”

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকায় উৎপাত ও জীর্ণতার ক্রটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা ; এক ধারে একটা শূন্য প্যাকবাক্সের উপর একটা টিনের তোরণে বরদার নাম আঁকা ; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলো পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্ৰেভেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সাস্থনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নাগকের তো এই দশা ; নাগিকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শব্দরবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাস্তি ছিলেন চিরকথা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিসুশাস্তির ভাষা ছিল খুব প্রথর ; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কোলীনের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া, এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্ধামী বুঝিতেন, ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে-আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে, সে-কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাশ করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত, যেন কোনো গতিকে পাশ করিয়া বরদা অস্তুত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাধিবার চেষ্টায় লাগিলেন, পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিবাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমেই চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাশ করে—এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বাড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মনের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই, ওদিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জ্বালাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অস্তুত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অহুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারও মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে তৈর্যমাগের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই গদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশঙ্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বেগ করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে

লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন, সে-কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মাহুঘটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি সে যে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোকম মূনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রত্যহই অস্তিত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। ঘাই বল, বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, মোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অগ্নায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সাস্থনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকমান করিয়া তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাচেন—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে ঘেঁষা আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই ঘেঁষা অস্তরে অস্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আল্‌মারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরাগের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে-বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর'।

একদিন যখন বেলা দশটা— অস্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চূপড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাসেলের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ ‘জয় বিশ্বেশ্বর’ বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্ত্র মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, “পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।”

এই শুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে স্বপ্নের কাছে বধুর আব্দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু তিনি বারো টাকা স্বেচ্ছা ধার করিয়া সংকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাহদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ক্রটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত, তাহদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অস্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বলিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজুট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্তরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ধরিয়া তার সংসারের সমস্ত

আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই অল্প তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তকণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জালানো থাকে। রাতে শুইতে যাইবার আগে, ‘কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছবে’ এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শত্রুও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কখন পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গায়ের তার গেকুয়া রঙের তশর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দূরের রেখা। ইহার উপরে শত্রুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুগ্ধ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমশায় বলিলেন, “একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।”

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই খন্ত-খন্ত করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধূলা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সন্ত্রমে চূপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তশরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেকুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝিবুঝিবু করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাণির সুর আসিতেছে সেইটে চূপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন

হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্মিল্ করে, সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার আনালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোকুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ— পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি; যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে; তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস্মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— ষোড়শী তো কৃচ্ছ সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে-পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেকুয়া রঙকে আরও ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, “আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।”

পণ্ডিত বলিলেন, “মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে।”

তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল, তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে— তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চূপ করিয়া রহিল।

মাথনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, “বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।”

মাখন বলিলেন, “সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ, সেইখানেই তোমার নাগাল ক-জন লোকে পায়।”

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মাহুঘও জুটিয়া গেল। মাথনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো— অর্থাৎ থায়-দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর

কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবিভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িটাচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল, একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটুকিলে। এই পালক তিনটি যে, সস্ব, রজ, তম; ঋক, যজুঃ, সাম; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; আজ, কাল, পশু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেদ্বিলইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম. এম্-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সার্বজ্জ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য-ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্ত নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্ত যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। স্তত্রাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী সভ্য হইতে হইল। গৃহী সভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্ত দান করা। গৃহী সভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় খার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অকটার উপরে নিচে ওঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নিচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়োকিছু বাকি রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, “দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।”

মাখন উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন, “তাই তো, কী করি।”

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত যত্নস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, “মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিকবে।”

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেবই যোগ্য বটে।

৩

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে ; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ । একদিন ষোড়শী তার যোগী শিকককে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন করে জানব ।”

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন ; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, “জীবিত আছেন ।”

“কেমন ক’রে জানলেন ।”

“সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না । কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসাধারণ তপোবলে । তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক’রে নিয়েছেন ।”

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল । নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্শা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা অপিতে অপিতে তাঁর স্তব্ধ অপেক্ষা করিয়া আছেন ।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি ।”

যোগী ঈষৎ হাস্ত করিলেন ; তার পরে বলিলেন, “একখানা আয়না নিয়ে এসো ।”

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমতো তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল ।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছ ?”

ষোড়শী বিধার স্বরে কহিল, “হাঁ যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে ।”

“সাদা কিছু দেখছ কি ।”

“সাদাই তো বটে ।”

“যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?”

“নিশ্চয়ই বরফ ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল ।”

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন । সেখান হইতে তপস্শার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড ।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল । তার স্বামীর তপস্শা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার

মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কঞ্চল সে গায়ে দিতেছিল এখন সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, “মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম, দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোনদিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।”

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের ঘেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, “ভয় কী, বাবা।”

মাখন বলিলেন, “আমরা দাঁড়াই কোথায়?”

ষোড়শী বলিল, “নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।”

মাখন বুঝিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চূপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়-পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, “চিনতে পারছেন না?”

“এ কী। বরদা নাকি।”

বরদা জাহাজের লঙ্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্ এক কাপড়-কাটা কল-কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, “আপনার যদি কাপড়-কাটা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় ক’রে দিতে পারি।”

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মস্তটা ছিল এই—

যাবজ্জীবন নাই-বা জীবন
ঋণঃ কৃত্বা বহিঃ পঠেৎ ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম্‌টেব্ল্‌ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসম্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শুর বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোঁওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয় বল, অগ্রমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরলীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাওড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর খুড়শাওড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চকুর ভিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাশ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিচার তোলা জলে আমার স্নান নয়—শ্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিচার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইকু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল বেছাম পেরিয়ে কার্ণাইল-রাঙ্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টারমশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে আওর

কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থানু নয়— সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্সপ্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্সলি-ডাক্সিনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসনকেও বিচার করতে ডরায় নে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্লিকের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও ছু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরানো যে মাঝে মাঝে তার ইফ-ধরানো ভাপসা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেনে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অধৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতধৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়; তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সন্ধ্যা কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো গুঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যার ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয়, সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আঙনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা

কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ক্রকুটিভঙ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ক্রচাপে কিরকম চাপল্য উপস্থিত হত, তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যাকিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও তাঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল, তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিজ্ঞা আহির করবার জন্তে নয়, পরের উপকার করবার জন্তেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্তে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না— যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্থন্থ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমে নি— তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন— সৌজাত্য-বিজ্ঞাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল, তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্তে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শব্দরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে— আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার

শুভর আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, “মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জগে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।” তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জগে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, “এ টাকা স্নুদে খাটাবার দরকার নেই— নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।”

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শুভর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝাঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মাহুঘ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন মা হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু, অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, “সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।” অনিলা বললে, “মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।” আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যালয়িকার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বললে না, না’ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাশ করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ে-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যাকিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাচে প্যাচে বিচ্ছেগুলো আঁট হয়ে তাদের

মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে ঘেন ছাড়ে বিজ্ঞাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য ঘবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাস্কের শেষে সেই ঘবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দৈতদের নিয়ে বের্গস'র তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের নিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে-সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্ধামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অস্তুত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মখিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দৈতদের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উত্তোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সঘন্থে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করতে আমি শুদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলী, এবং ধরে নেওয়া যাক, তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতবড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো

জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিভক্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্তমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুন্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহ্য দিগ্নে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জ্ঞো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমোলী সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে, তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লঙ্ঘন নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বায়ে ক্রমেক্ষমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা সহজে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ক্রহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একছোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যার গাড়ি তিন স্বয়ং ইঁকাক্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনো-মতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্ম-রক্ষা করলুম। দেখলুম, আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ ইঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই কমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে-ব্যক্তি জুড়ি ইঁকিয়ে ছোট্ট তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক

বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়াল মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়াল আকস্মিকটার জন্মে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি জ্বর দখল করে বসে আছেন। এইজন্মে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন-নখর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা-নখরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে-তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বান্তে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন শশকে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরওয়ানের দল কেউই স্বরসংঘম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে নৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশাস্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারঙ্গে, নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসূচক, অপর পক্ষে একদা য়ে-দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিত। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার খলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে— এবং উপরস্থ চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার হৈতুগুলি তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝনঝন্ শব্দে আমার শারির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন চন্দ্রতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল, আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যস্বাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অশুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে— দুর্লভতার কারণ

জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্তে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শাসি ভাঙছে, আমার শাস্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অমুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সঙ্কে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যাহ বেড়ে উঠছে, সেটা তেমন আশ্চর্য নয় কিন্তু আমার স্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিত ছিলাম, এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়— শুধু অমৃতের ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রত্নিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি-এ পাশ করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি এ পাশ-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সঙ্কে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কনে ট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের স্বর সঙ্কে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু, আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি— তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার স্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরে চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, “পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।”

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, “দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগ্যে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।”

কানাইলাল হেসে বললে, “যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।”

আমি বললুম, “না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।”

অনিলা ছ-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তারপরে জনশ্রুতি শোনা গেল, ষতী আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মঞ্জলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মুখে ষতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশুমৌলীকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা ছরস্তু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম, আর ভাবতুম, ‘আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!’ পটুড বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের ‘পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের স্বর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সীতাংশু এসুরাজ বাজাচ্ছে। ঐ যন্ত্রটার ‘পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে—সে আপনার সমস্ত স্বর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে

দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত ছলভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কল্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুক্কদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অল্প বাগা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পত্নীই নতুন বাগায় পাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্ত মনটা উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িঘর মূলত বিবর্তিত। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাহের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, “কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।”

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, “সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।”

আমি বললুম, “হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বেগম’র উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাটনি পর্যন্ত।”

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, “অষ্টেভাবাবু, আমি বলি, আজ থাক।”

অবশেষে প্রসন্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্রালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গণনা পেয়েছিল—সইতে না পেয়ে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি ভিজ্জাসা করলুম, “তুমি কোথা থেকে শুনলে?”

সে বললে, “পয়লা-নম্বর থেকে।”

পয়লা-নম্বর থেকে! বিবরণটা এই—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে ষখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাতে সিতাংশু-মৌলী এই খবর পেয়েই তখন সেখানে গিয়ে পুলিশকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংস্কার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অস্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করছে। ষখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাতে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে।

আমি অভিযোগ করে বললুম, “আমাকে কিছু বল নি কেন।”

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে—কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত ‘তোমাকে বলে লাভ কী’, তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব—সংসারের স্তম্ভ দুঃখ—নিয়ে কী করে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, “অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।”

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, “কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।”

আমি বললুম, “আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।”

সে বললে, “তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।”

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পাসের্ণনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্ ব’লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যায় সময় আমার হৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমোলী চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনই শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম “শোবে না?”

সে বললে “বাসনগুলো তুলতে হবে।”

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার চশমা চাপা দেওয়া এক-টুকরা কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে ‘আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।’

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অল্প অল্প খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং খোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার খণ্ডরবাড়িতে খোজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা

ঘটলে সে সশব্দে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বৃকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরওয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাক করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম শ্রায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানব-সমাজের পুরাতনতম একটি অশ্রায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়াবু, টলস্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এইরকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে স্মৃতিস্মরণ করে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন স্থনিশ্চিত করে ঘটতে পারে, তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাজ্জা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বুদ্ধবুদ্ধ ফেটে গিয়েছে। গেছে ষাক্ গে— কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্ধবুদ্ধ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিকে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেওয়ালটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুকরো করে ছেঁড়া। মনে হল, পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

‘আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

‘আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিশ্বাসের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না, জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো কৃতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ করো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।’

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ঋণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে, আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার ঐশ্বর্যকে এবং নব্যতায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সূত্রাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জ্ঞাও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার কৃতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

‘বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদৌর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার

দুঃখই তোমার অন্তর্ধামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেসাদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ার আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।’

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাতের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্তে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান ক’রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, “আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।”

এই ব’লে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড-কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, ‘আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খোঁজ পাবে না।’

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অধেক।

আষাঢ়, ১৩২৪

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজ্ঞাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন

পেলেন ; আমি কোয়ার্থের লাস্ট্ বেকিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম ।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স পাস করেছিলুম । তখন বিবাহ কিম্বা এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না । আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্মে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি । ইঁহুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাওয়াই হোক আর অখাওয়াই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল । সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্মে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল । তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিতমশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম ।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । তখন আমরা ছিলাম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায় । গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই স্পষ্ট মিথ্যা ; যাদের বসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে । বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন । মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত ; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার স্তম্ভ ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার । এইরকম পারমাণিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায় । এইজন্মে মা তাঁর কাছে বিশেষ রুতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উলটো ।

আজ আহারাশ্চ দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলাম । সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই— আমার তো কল্কাভায় কলেজে যাবার সময় হল । এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্মে একটা সত্‌পায় অবলম্বন করা কর্তব্য । যদি একটি শিশুবধু মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মাকুষ ক'রে, যত্ন ক'রে তাঁর দিন কাটতে পারে । পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কানীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত— কারণ, সে শিশুও বটে, স্নহীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্ক অঙ্ক মিল । তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমাণিক ফলও লোভের সামগ্রী ।

মায়ের মন বিচলিত হল । মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন । মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না ; কেননা, কচির সঙ্গে পুণ্যের

বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বললেন, মেয়েটি স্থলকণা— অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ স্থন্দরী না হলেও সাধনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে-পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্ঠার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ— এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবস্তু-প্রকরণ ঘেন তার সমস্ত অস্থির বিন্দু বোঝে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, “সন্তু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেগ্।”

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীখরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপামোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট— সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। ঘটটা মনে পড়ছে— রঙ শামলা; ভুরু-জোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেগীওয়াল জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অল্প সমস্ত ছলভ সামগ্রীর জগেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জগ্ নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জগ্ আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ স্মৃত্তে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অল্প সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি, কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌকষ দিয়ে সব-চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা-কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজগ্ ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার

রূপশূণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমরা খেলুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি ; এবং তার জন্তে সমস্ত অপরাহ্নকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর— কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শণবাস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসানিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ করে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রক্তনের বা ব্যবহার ক্রটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে-রকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনার কাশীশরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাকনোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে বসে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের মল মুছে, এই করণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নিচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল ; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিন্ডিগাটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নিচে পড়ে গেল।

বারান্দায় বসে কাশীখরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলাম ; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে । আমি তাকে বললাম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাদিকের আলুমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে ; আমি বললাম 'আঃ, এটা নয় ; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে— সেটা আমি ধপাস করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লাম । তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছলছল করে উঠল । আমি গিয়ে দেখলাম, তিনের শেল্ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্ফে । বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলাম কিন্তু কাশীকে তুলের কথা কিছু বললাম না । সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নিবুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না ।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে । এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কতৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য ।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন । আমি জানি, মা আশু আশু সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সহিয়ে সহিয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন । বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুভ বলে ঘৃণা করতেন ; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মূহুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কণ্ঠার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন । কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল । বিবাহ ষে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাসি রাখেন নি । এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্টাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের ভ্রমণে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন । শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে । বাবার আদালতের উকিলের দল চাদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি । স্থানীয় এন্ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেছে । সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন । ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশাবিত্ত হয়ে উঠেছে ।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কাশী এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মামলা ডিসমিস এবং প্রচণ্ড তেজ্জে শাস্তিদান, পণ্ডিত-মশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীখরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসদ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চূপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিষয়— তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজ্ঞাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে— আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা বেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম-এ পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোর্কের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দমাগর মন্বন করে ডিগ্রিরত্ন পাশুয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্বনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রিন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব-চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেম্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুকব্বির বাজার এমন কষা ছিল না তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন এবং পেন্সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন পারাপ, তাই বাবা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর বংশধর গভর্নেন্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষ্যে কমলা লেবু ও অগ্ন্যাগ্ন উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম-এ-পাস-করা ছেলে কন্যাভাগিকের পক্ষে খুব

‘প্রাংশুলভ্য ফল’। এইজন্মে কন্ট্রাক্টর বাবু আমার প্রতি ‘উদ্বাহ’ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধূলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অস্তিত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছিল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয় ; তখন খাঁটি স্বীয়ত্ব ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চার দিকেই সংকুচিত ; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে ক্লম্ব করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুঃগ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলাম। আসল কথা, আমাদের দেশের গ্রহমানে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রূপ করে কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যি বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার খণ্ডির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লাম। বাবা বললেন, শুভস্র শোভঃ। আমি চূপ করে রইলাম ; মনে মনে ভাবলাম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলাম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট করে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কমলা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাখেন ; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সহজে তিনি সর্বদাই সংকুচিত ; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে ঝাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা।

তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থার ঘট অস্ববিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে স্ফুড়ি হয়; সে ছায়া সন্ধ্যাও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্কির ভিতরে বসেই গদ্যশ্রবণ করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে, এটা তিনি সহিতে পারতেন না। এইজন্তে আমি যখন তাঁকে বললুম “মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই”, তিনি হেসে বললেন, “না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!”

আমি বললুম, “তা হলে আমি বিদায় নিই।”

মা বললেন, “সে কি, সূরু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।”

আমি বললুম, “মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্তে নয়, তার বুদ্ধি থাকতেই পারে।”

মা বললেন, “শোনো একবার। এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।”

আমি বললুম, “বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। ইঁপিয়ে মরে যায়।”

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সন্ধ্যা বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অল্প মানুষেরও ইচ্ছা বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জ্বরদস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোধে স্নান আর্হিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সঙ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন সূযোগে ক্রমে ক্রমে কানে মস্ত দিয়ে, ক্রমে ক্রমে অশ্রুপাত করে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, ‘ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।’ কলেজে

লজ্জিকে পাশ করবার বেলায় ছাড়া স্ত্রায়শাস্ত্রের জ্বোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আশুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁহাকে স্বরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং ক্রটির চেয়ে শুচিতা মন্বতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, গিফলিজ্‌ম্‌টাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে ধামিয়ে রেখেছি কিন্তু মনকে তো চূপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনকরণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা কতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অমুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে অবলাজ্ঞাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজ্জিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, বাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। স্ত্রায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে স্ত্রায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্লস্‌ অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে স্ত্রায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন স্ত্রায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোঁওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকতে ক্ষণে ক্ষণে

মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাতে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল; আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অকটা এখনকার নির্ভাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম, কণ্ঠার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিలిয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিস্টারের নিচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নিচে ছিলাম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অগ্ন একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ খেয়েছি, রাতে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্ট্ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে, ব্যাসেলস, ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরেজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক স্বরে বেরোতেই চায় না। আমার ষতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাতে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরেজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাটি বন্ধি মি স্বরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি গির্গিট-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে স্থলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোবাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি একসেপ্টের একটু খুঁত কিম্বা কাঁটা-চাম্চের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মহুশ্যত্ব সহজে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা

বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়েজাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সঙ্কল্প পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স ষত বাড়তে চলল বিবাহ সঙ্কল্পে বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি, ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির ছুটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে, পার আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেয়ি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি, কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি, কোনো সাবালক মেয়ে অত্যন্ত কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যন্তমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব, এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন।

তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় বহুগত জ্ঞান থাকে না। কাশীখরী খণ্ডরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পন্নিবৃত্ত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বাধাকোর অপরাহুকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরশতক আর্ধ্যসপ্তশতী হংসদূত পদাহুদূতের শ্লোকের ধারা হুড়িগুলির চার দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, “পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী!”

তিনি বললেন, “বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ তাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই তাঁদের মালা।”

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভাবে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি— চার পাশে টিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোঝানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূণ্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কর মতো শূণ্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বাধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম— দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেবি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি— যৌবনের শেষ খলিটি ঝেড়ে নেবার জন্তে পঞ্চাশ রাস্তার

ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে-অংশে মূলতুবি পড়েছে সে-অংশে আর তো কিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিককে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি ‘একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না’, এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, “আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।”

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল—এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে সামান্ত বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্ত কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাম্প্রিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, “আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্ধামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।”

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হয় নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্ত ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত ধুঁধুঁতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অগ্নায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না।

প্রথমটা তাতে তাঁর ষত অম্ববিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাগিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাগিস্ট্রেট বললেন, “সাধুলোক পাই কোথায়?”

তিনি বললেন, “আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।”

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জ্ঞানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, “এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে— না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—”

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, “হিয়ার হিয়ার!”

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়— কোনদিন তিনি মারা যাবেন, তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অমুনয় করে বললেন, “যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।”

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্ম তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকষলের মধ্যে থেকে ঋতুবিজ্ঞ

বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে— তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তুপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, “পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।”

“কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—”

“না দেখেই হবে।”

“কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। যা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।”

“পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেদিকে ভাবতে হবে না।”

“তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—”

“সে এখন বলব না, তা হলে জানাঙ্কানি হয়ে বিবাহ ফেসে যেতে পারে।”

“মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।”

“বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এতবেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্টার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্টার মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।”

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারণে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দূরত্ব বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সহী করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, “পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।”

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কুপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অস্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিখাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি

না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, “আমার নাম দীপালি।”

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, “আমাকে বিবাহ দেবার জন্তে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।”

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম “জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?”

সে বললে, “না, কোনো পাত্রকেই না।”

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব’লে মনে হল না। আমি বললুম, “যে-পাত্র আমি তোমার জন্তে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।”

দীপালি বললে, “আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।”

আমি বললুম, “সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।”

“কিন্তু, না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।”

“আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।”

“আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কল্কাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।”

বললুম, “কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।”

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, “আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?”

আমি বললুম, “আমি কাল সকালেই যাব।”

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ?’

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে-আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন ছুঁকার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার অন্তে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে, এমন যোগাতা তার নেই। ও ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্তার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রফেশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, “যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রহি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।”

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুন্নয় রক্ষা করেছি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুন্নয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল, সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্টার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সম্বন্ধমতো বিবাহ না সেরে রাখার মূলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম, উপরওয়াল প্রসন্ন হলে ছোটো-একটা ক্লাস ডিভিডিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পৌষ, ১৩২৪

প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে

উৎসর্গ
কল্যাণীয়
শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

রসসাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলক্ষিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অত্যা হোক, কিছুই আসে-যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের সেই অত্যাের উপলক্ষি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলক্ষির ক্ষুধায় ক্ষুধিত; রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে 'ওথেলো' নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদবেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এস, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আশ্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত, মন নাস্তিহের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা ; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বল্ল করবার জন্মে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে ; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীটসের বাণী মনে পড়ল : Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনৌষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে, সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময় । অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে । মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে । মানুষও লীলাময় । মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে ।

ইংরেজিতে যাকে বলে real সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য । তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলক্ষের দ্বারা । মন যাকে বলে ‘এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম,’ জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়— সে অসুন্দর হলেও মনোরম ; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে ।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয় । এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ ।

মানুষ নানারকম আশ্বাদনেই আপনাকে উপলক্ষি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে । সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য ।

কিন্তু, এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয় । সকল উপলক্ষিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয় । আনন্দসন্তোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে । মনস্তত্ত্বের কোতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ । সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায় । কিন্তু, আনন্দ-সন্তোগে স্বভাবতই মানুষের বাহ্যবিচার আছে । কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে । তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায় । কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন । কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব

ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সন্তোগের দিন, তখনকার সাহিত্য কণিক
আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে
মিশে যায়।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিকমতো করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সমস্ত খারাপ পড়িয়াছে— এই-সমস্ত ছুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহাৰনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ছুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্তের তাহাতে যতই আমোদ হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ করিতে হয়। সহ যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক তাহার লেখাটা তো রইলই।

অতএব, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু, এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপর্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে, আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল, এমন-সব হতবুদ্ধি লোকের জন্ত পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া বাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে, কটাক্ষে বাহারা বুঝিতে পারে বস্তু

কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব, বাহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্‌স্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু, সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন-না কেন চিরকালই তাহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সামলাইবেন সেটা তো খাত্তী এবং ধৃত কাহারও পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্টা বস্তু এবং কোন্টা বস্তু নয়।

মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মাহুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সঙ্কানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু। বলা বাহুল্য, এখানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাত পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সঙ্কান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া ভাল টুকিয়া বলেন, 'আমিই সেই রসিক।' প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এইজন্যই সাহিত্যসমালোচনার বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দাগালির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনার কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সব্বর করে না। কেননা, সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য বাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কী। আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ, তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাদ্দ তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভয় দেওয়া চলিবে না।

রসবিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্যবস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজ্ঞদার কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবি করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজ্ঞদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপর পক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহার নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য, কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘনৃতী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই ক্ষিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাশা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তন্মাস করিয়া একেবারে হতাশাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন, 'দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মাহাত্ম্যের আমলে মাঝুখ যে-রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু, বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা, মনে করা যাক, কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম, দেশে সব-চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণসভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মতো চকু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো। অতএব, বাঙালি কবি যদি ইহাকে তাহার রচনার আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই বুদ্ধিমা লিখলাম পৈতাসংহার-কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হয় যে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে ?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে, বাস্তবতা জিনিসটা কী তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল 'গোরা' উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না-আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সব-চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি, প্রচলিত হিন্দুমানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি, ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনাদি হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর ক্রিয়া উঠিয়াছে। সেটা সঙ্কে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর-কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দুরমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নাট্যিকাদের মধ্যে দেখা যায়; অথবা নিন্দা করি, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজমের জরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্কে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্কে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাণিতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাতে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।

আর, কীটস্, শেলি— ইহাদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়া নির্ধারণ করিব। ইংরেজের জাতীয় চিন্তের সুরের সঙ্কে সুর মিলাইয়া কি ইহারা বক্শিশ ও বাহবা পাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাতে বাস্তবতার দালালি করিয়া

থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অস্ত্রাজের মতো তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীটস্কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরও আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল। কিন্তু, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্ত্র বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে—সেই স্থূল বস্ত্রটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা। কিন্তু, দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয়তো উত্তরে শুনিব, আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারা ই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের। বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে ছিটাকোটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিকিতে পারিবে না।

কিন্তু, সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ, এ দিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই-যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ

নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজি হটক আর বাঙালিই হটক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু, দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে।

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইন্সলু-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে ছুঃখি-কাটাসের ঘরকরুনার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো লেজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিগ্‌নাগাচার এই-ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিরূপে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিরূপে এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা জ্ঞানের অধ্যাপক নহেন। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল— আজকের সাধারণ মানুষ বাহা বুঝিল না

কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্ত হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন— তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলো শতাব্দীর কী দশা হইত।

তুমি কি মনে কর, লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু, সে কি সাহিত্য। ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বংসর-অম্বর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্ত সাধনা করিতেই হইবে— রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু, সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক— যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারও আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-স্বর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য, লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়াল-মতো এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কী। একটা-কিছুর 'পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি ছড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দেশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সন্দেহে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তুর ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে

সেখানে নানা মূনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফেশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই 'পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় স্মৃতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা; যে-লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—স্মৃতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রাগ দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিয়ারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে-উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত আদর্শের নকলে কৃত্রিম নকশা কাটা হয়— এইজন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব, কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন, তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে— এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে, যদি নিজের মনে তিনি ষথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য, পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনা মাতৃষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

১৩২১

কবির কৈফিয়ত

আমরা যে-ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিমসমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে কতি ছিল না। একটা জিনিসকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটা কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রামরাবণের লড়াই, তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কী বলিবে যাহারা তিন ভুবনে কেবলই তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি, আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি-মাস্টার তাঁর সব-চেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারিতে পারেন— বলিতে পারেন, ‘ওহে, তুমি নেহাত ওরিয়েণ্টাল।’ কিন্তু, তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

‘লীলা’ বলিলে সবটাই বলা হইল, আর ‘লড়াই’ বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়। ভাঙখোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মন্ততা। কেন রে বাপু, কিসের জন্তে খামকা লড়াই।

বাঁচিবার জন্ত।

আমার না-হক বাঁচিবার দরকার কী।

না বাঁচিলে যে মরিবে।

নাহয় মরিলাম।

মরিতে যে চাও না। .

কেন চাই না।

চাও না বলিয়াই চাও না।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর-জবরদস্তির সব শেষে একটা খুশি আছে— তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। শতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা— মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর-কিছু নাই। এমন স্থলে শতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই, তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু, এ-সব কথা বলা কেন। জীবনটা কিছা জগৎটা যে লীলা, এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা না-করা নির্ভর

করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্ত কবির উপরে রাগ করার বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন কী।

তিনি আর যাই বলুন, লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে, জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি, ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে, কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বলো।

আচ্ছা, ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই-সব কথা আমার কাব্যে বারবার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহারা হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে কি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু, সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এইজন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহংকারের মতো শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহংকার করিলেও দোষ নাই। অতএব, এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হইল।

বাক্যে কথা আসিল। যে-কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা— অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরতকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব-চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাচ্ছ্যেব ধর্ম্মানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রদৃশ্যাদিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, বেদায়েষি নাই? আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই; নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কো হেবাশ্চাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত— অর্থাৎ, কেইবা দুঃখদ্বন্দ্বা লেশমাত্র স্বীকার করিত— আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ, আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব, দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা যখন বল, হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্রাক্টস্— আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিকিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কী।

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন-কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু, ষেরকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক অনির্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, স্তবরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এ দেশে প্রয়োজনের হাটের মানুষ দিতে হয় নাই। কিন্তু, শুনিতে পাই, পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিষ্ক্রিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। স্তবরাং, কোনো কথাতেই অনির্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েন্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয়, তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুশি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবি মাত্র, তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে বা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিং ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাঠবস্ত্র গাছ নয়, তার রস টানিবার

ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয় ; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ— তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময় । গাছ আমাদেরকে যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই । এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য । গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই । এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়, ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায় । সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয় । বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ । এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ । তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে ।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে । তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না । বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না । কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায় । এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনোপ্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায় । কিন্তু, তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তালরক্ষা হয় না । ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব-চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে ।

একটা দৃষ্টান্ত, ছেলেদের শিক্ষা । মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই । পাখি উড়িতে শেখে, মা-বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ— বিচার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণাস্তিক লড়াই নয় । সে-শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ । গুরুশায় এবং পাঠশালা কী জিনিস ছিল একবার ভাবিয়া দেখো । মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে, বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে । এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব, এটা বিষম গলদ । কেননা, সৃষ্টিকর্তার মহলে বিশ্বকর্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি, ভাই ।

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ । বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল । অথচ আজ দেখিতেছি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দস্বরূপে ক্রমে লাগিতেছে— সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল ।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই । বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুইজন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল । তাহাদের মুখ হইতে আমার

দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পৰ্বন্ত দুবিয়া উঠিল। কিন্তু, তাহারা নিজের স্বার্থ তুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দটি ভাল ফর্দ নয়, অন্ধেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে, কিন্তু সেটার মতো নির্ভর অন্য় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুখাঁফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্তব্যনীতি যেখানে কর্তব্যের মধ্যই বন্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাবস্ট্র্যাকশন্, সেখানে সম্ভাব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ন্। কেননা, দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু, এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্ঘ হইয়াছে যে, আমরা নির্লঙ্কের মতো বলিতে পারি যে, কর্তব্যের সরস না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলেই ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! আমরাগকে বড়াই করিতে হইবে যে, আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝগাট যত বেশিই হোক-না, সেখানেই তার আনন্দ। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, স্বার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্ণাইল প্রতিভাকে উলটা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্ত নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তরের কর্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্নের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর-কেহ কিছা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মতো নহে, তার পা তার জুতার মতো। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু, এমনতরো কুৎসিত হইবার মন্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই; কিন্তু, নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া, কচ্ছু সাধন ছাড়া, কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এইরকমটা ঘটিয়াছে। এইজন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ খুব্ড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ-সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আঙড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা স্ত্রীকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মতো বাঁচিব, রাজার মতো মরিব।

আমাদের সব-চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবৌর্য এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চালা কাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। ষতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে; ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ খুব্ড়াইয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আপিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক-ঢোলই খুব উচ্চৈঃস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভালো— বলা ভালো, এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্বাদ, আর জলাদই আমাদের ত্রাণকর্তা।

তা হোক, বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে, বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝংকারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদর্শন হইয়া, শুকতালু লইয়া, লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধুলার উপরে। কিন্তু, কবির বীণায় বরাবর বাজিবে : আনন্দাচ্ছ্যব খষিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না : Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে— সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে : আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুকিতে ধুকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ খুব্ড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

সাহিত্য

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মার ও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল, আমরা আছি ; আর-একটি, আমরা জানি ; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আত্মকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়—I am, I know, I express, মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনার নিয়ত উদ্ভূত করে। টিঁকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানারকমের সংগ্রহ রক্ষণ ও গঠনকার্য। 'আমি আছি' সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে 'আমি জানি'। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জ্ঞানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত ; 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত ; 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।

'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা— কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব, মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞানস্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে, মঙ্গলগ্রহে যে-চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পাড়িত হয়। অতএব, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগত ক'রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত করে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টিঁকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে-পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্তের টিঁকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয় ; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্ত সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্তের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য ; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে

নানা-প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অগ্নের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবার ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিকে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উচ্চোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু, তার বিস্তৃত আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিকে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেত্ন, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই— সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র-প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই ধায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে ষতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কক্ষবর্গ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি— 'এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার

মলিন সখর হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষভোগ্য টাকার বর্ষণভায় বহুক্ষরা পীড়িত। দৈন্তের ভাবের মতো আর তার নেই। টাকা যখন দৈন্তের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মাহুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সেই দৈন্তেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ— সে যার কেবলমাত্র তারই, এইজন্মে তাকে অহুভব করা যায় কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্তপঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্রামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্ছে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লঙ্কার কেবলই টাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা, সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে— আর, ঐ-যে উচ্চতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের 'পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেলাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে সে কিছুই নয়, কেননা ওর নিজের ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না—মাখবীষিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।'

এই যে তাজমহল— এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহবেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি ষে-কোঠাতেই রাখুন তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন-পর নেই, সে অনন্তের বেদি। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যবৃত্তি করে তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের খলিটারও পেট ভরে না, স্তবরাং ক্ষুধার অঙ্ককারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর, যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্বত্রের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অহুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত হচ্ছে ঐ— অর্থাৎ, ই। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ঐ— নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত পড়া হয় নি; একদিন তার যতই শক্তি থাক-না কেন, সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো বড়ো নামধারী 'না'এর দল আজ দস্তভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামান-গর্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-বাংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রিপারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে

চলেছে। কিন্তু, ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কাণ্ডার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।

কিন্তু, আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে পারি। যদি বলি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্যকাল এবং নিখিলবিধ এই কথাই বলেন— 'যদেতৎ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তম্ যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন—তা উচ্ছিন্নীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই শাজী পাহারা দিয়ে তাঁর অন্তঃপুরের হংসপদিকাদের মহলে আটকে রাখতে পারে নি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন, তা খৃষ্টজন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে কি পরে রচিত। তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে। পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন, তা শিপ্রাতীরে রচিত হয়েছিল না গন্ধাতীরে। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর পক্ষে এমন-সব পাঁচালি আছে যার অল্পপ্রাসছটার চকমকি ঠোকা ফুলিঙ্গবর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই-না কেন, সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল স্থনির্দিষ্ট; কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বকাল তাদের বর্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো বার্থ কুল-গৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ করে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদখানা হত তা হলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে বসে থাকতেম, বলতেম 'আমাদের পানাহার বন্ধ'। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই দেখছি, কেবল যে চারি দিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পার্টকলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্তে তো কারও মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে-মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু, জগতে তো দেখছি, সেই মনোহরণের আরোজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, দেখছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষী রয়েছে সামনেই। তা হলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে না রয়েছে কবির আনন্দ?

এই-যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, এই-যে আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্রাবন, এর মধ্যে তো কোনো অবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাই নে। কুখার মধ্যে একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা 'না'এর ছাপ-মারা জিনিস। 'হাঁ' আছে বটে কুখা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় বলে অভ্যর্থনা করে নেয়। তা হলে কোন্টাকে সামনে দেখব আর কোন্টাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাকশালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্তার উদ্দেশ্যটি কোন্খানে প্রকাশ পায়— যেখানে, নিমন্ত্রণপত্র হাতে, ছাতা মাথায় হেঁটে এলেম না যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন— তাই আমাদের হৃদয় বলে 'আঃ বাচলেম'।

শুরু সঙ্ঘ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে— যখন কমিটি-মিটিংয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য ধবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তারপর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিস্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপময়ুতং যদ্বিতাতি। সেই যে ষৎ আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ। সে কি শক্তি-পদার্থ।

রায়াঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ভোজের খালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগলসত্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠ-খড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্তি কোথায়। আওরঙজেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্তে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্তরেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি শুরু করেছেন। আর, তাঁর আলোক-রশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা, তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তা হলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলাম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিখাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপরে পাগলা ঝড়ের যে-নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্তে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের

মোকাবিলায় বহুশ্রালাপ হতে পারল। নাহয় ডুবেই মরতেম— সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাকুরেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে ছটো-একটা চক্র-হাওয়ার ক্রত-তালের তান শুনিতে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, 'তুমি আমার আপনার।'

অমৃতের ছুটি অর্থ— একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় যাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন— অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়, রূপদক্ষ যে-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুজয়ী।— এই 'রূপদক্ষ' কথাটি আমার নূতন পাওয়া। ইনস্ক্রিপশন্ অর্থাৎ একটা প্রাচীনলিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।—

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন সবে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাকা দিলেম। সম মানে তো থামা, তাতে আনন্দ কেন— তার কারণ হচ্ছে, আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু, টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো সবে মাথা নেড়ে বলি নে— 'আঃ'।

গান থামল— তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থামল না কেন। তার কারণ, গানের মধ্যে একটা তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে— কাজেই সে সেই 'ওঁ'কে আশ্রয় করে থেকে যায়; তার জন্মে কোনো গর্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না। কত অমূল্যখন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্তকে করে নি। সেই দৈন্তের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরিব চাবার রক্তকে ঘূর্ণীচাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফার পরিণত করা হচ্ছে। গঙ্গাতীরের বটছায়াসমাপ্তিত যে-দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হা-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্গীর্ণ করেছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা, আনন্দলোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায়; ভয় নেই, কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের

ভালিতে অমৃতময় আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আঁক্কেপে ভূতল থেকে তপ্তগন্ধ উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল তারা আর ফিরে এল না; যে-সব অগ্নিগিনি রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্লে ক্লে ক্লে তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্ভত হয়েছিল তারা কোন্ বাশি শুনে শাস্ত হয়ে গেল। কিন্তু, কচি কচি শ্রামল ঘাসের কোমল চূষন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটাগাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হল কটিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বৃকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্যের কিরণকে সে ধ্যান করে সেই ধ্যানটুকু তার বৃকের মাঝখানটিতে ঘেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, এ কি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর অতি বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অস্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনও রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের বাচাই হতে থাকে। খৃস্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খৃষ্টিয় পুরাণে আছে। মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হল না কি। কিন্তু, একটি কথা মনে রাখতে হবে— আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মুহূর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে— আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে— আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনার অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু, আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তরে বাহিরে রসের যে-পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্লে ক্লে ক্লে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে; তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পরে আর-কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য বা কলা-রচনার মাহুষের যে-চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মাহুষের খেলা করবার প্রবৃত্তিকে কেউ কেউ এক করে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসরবিনোদন; সাহিত্য ও ললিত-কলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্ছে প্রাণধারণ, টিকে থাকা। সেজন্মে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরও একটু বড়ো হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রার দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে-মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্তেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এইরকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্ত আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলার প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্ছে ফলাসক্তিহীন কর্ম; এখানে কর্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসঙ্গেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্মে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রার যে-লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে-প্রকাশচেষ্টার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্তে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বলতে তো মন যায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনোই নয়।

বিজ্ঞাপতি লিখছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,

নব জলধরে বিজুরিরেহা স্বপ্ন পসারি গেলি ।

গোধূলি-বেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে—
আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যাহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার
দ্বারা ভারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে
সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার
করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি
এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্য-
বিজ্ঞাপনে উপমাসংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটাই হচ্ছে আসল
জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন।
যে-শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা
করে নি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার স্বেযোগ মাত্র ঘটাবার জন্তে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়।
অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর
দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যই এ নিঃশেষ হয় নি। তার থেকে এ
অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী স্বেয়াকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা
দান করেছে; রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয় নি,
বহিঃসংসারের কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি করে নি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে
প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে-চেষ্টা তাকে খেলা না বলে
লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন-
সাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্যকর্মের, দৈনিক জীবনের সখ্য থাকতেও
পারে। কিন্তু, সেটা অবাস্তব।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি
কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়।
যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না
পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই
এক যখন লীলাময় হয় যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন এককে
বাহিরে সুপরিষ্কৃত করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য করে, উপাদানকে

আশ্রয় করে একটি অথবা এক বাক্য হয় ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাঙ্গার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অবসিক সে এই চরম এককে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে।—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল মল্লি মালতী যুধি
মত্তমধুপভোরনী।

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সন্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে উদ্ভাবষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে স্থনিহিত স্থবিহিত সুষমায়ুক্ত যে-ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের স্বরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-এক দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, যা গৃধঃ— লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার

সেই লগ্নন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে ;
 বাকি সব জায়গায় সজে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব,
 লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও মলিতকলার ঐক্যের
 সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি
 টাকার খলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে ; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে
 সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে।
 কীটস্ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীকপাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন।
 তিনি বলেছেন—

Thou silent form, dost tease us out of thought,
 As doth eternity.

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও,
 যেমন নিয়ে যায় অসীম।

কেননা, অথবা একের মূর্তি যে-আকারেই থাক-না অসীমকেই প্রকাশ করে ;
 এইজন্যই সে অনির্বাচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে
 ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকৃতি যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বায়ে বায়ে
 পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদন্ডের কারুকলার
 মধ্যে আবিভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়।
 অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে
 ব্যাধিত করে রয়েছে। সে 'রোদসী', 'ক্রন্দসী'— সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে
 রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত— শূর্ষে চম্বে
 গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, স্থখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই
 কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি স্নানর
 জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের
 অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভারতে হবে বলেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল ; অব্যক্তের
 গভীরতা থেকে অনির্বাচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে-রস মানুষের কাছে এসে পৌছবে
 সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্তে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে-জল
 তার জন্তে, ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক, কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের
 প্রয়োজন কী ; কী বিচিত্র এর গড়ন, কত রঙ দিয়ে আঁকা। এ'কে সময় নষ্ট করা
 বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদন্ড আপনার চিত্তকে এই একটি ঘণ্টের উপর

উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে ; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হল। সে কথা মানি ; সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকগান ; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না। বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর খলি খুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হল না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সন্ধকে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।' এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁচেছে সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তনুরা হাতে নিয়ে ঘড় ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে। সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার অঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু, মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাবুকের চোটে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে চলবে। লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, 'আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হতে চাই নে, আমি তো পালোয়ান হতে চাই নে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'।

এই কথাটি জানতে হবে— মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীটসের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি— এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বাচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অত্যাসের স্থল পর্দার তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের

নিরে যায় ; সেখানে পায় হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে ? শ্রোতার মনে ভাবছেন, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানবাহ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য ; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আমার ব্যক্তিরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই-যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাগী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনই একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালি। কিন্তু, বাঙালি কী। ও তো একটা অবাচ্ছন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র— সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাত একের আলোকে আমি নিত্যতার উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলায় কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা ; এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা ; এখানে আমি বিরাত একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ্য করে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিস্তৃত হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু ; এই ছন্দের ঐক্যনৃত্যেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে ; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের

চক্ষে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই ধবরটির পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু, যে-মুহুর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্ত কথাটাই একটি সুবহার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, 'তাতে আমার কী।' কারণ, সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোখুলিবেলার বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হত; আশপাশের অধিকাংশ ধবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল এবং মনে মনে মিষ্টান্নবিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু, তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাড়া পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সংগীতের বাধনে ছোটো কথাটি এমন একত্রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্ত তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেয়েছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা সংস্থানের দ্বারা একটি সুবহা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিকল্পিততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ করে তার লেজের শেষ পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হলে গভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কী কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তা হলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ্য হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী। না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ।

এইরকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকার। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা-গীতের স্বভা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও বসন্ত তাকে বর্জন করেন।

আপানি কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে, এ কথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞার খবর দেবার অন্তে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ে তথ্যের মজুরি করে তারা কি ওস্তাদ।

অতএব, রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই—

খোকা এল নায়ে

লাল জুতুয়া পারে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে, এ সবকিছু কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু, জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক, বিলিতি দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভঙ্গতা নষ্ট করতে হল। তাতে আমাদের শব্দানুধি বিকৃত হতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

জানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁধি ডুবিয়া রহিল,

ধৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার

আছে ; রূপের পাথর বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার ঘোবনের বন কোন দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যারা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ কেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিঁড় ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলাম। বিষয়টি হচ্ছে এই—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ড প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেণীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধুরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার কুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ড দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ড বললেন, “অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্ত হলাম।”

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, “এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।” এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আক্রমণ হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা কাঁপটাকিছা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ে একখানিমাাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত ; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অসুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে

সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি হুলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায় ; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাঁটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বৰ্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপরিাপ্ত হোক-না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদি বা লিখে বসে তা হলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ুরক্ষা হয় না। অতএব, রসের জগতের আলোকরশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু, এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তুর হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে—

জনমঅবধি হায় রূপ নেহারছ নয়ন ন তিরপিত ভেল,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখছ তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আত্মিক বলছেন, লাখ লাখ যুগ পূর্বে ডাক্তারের মতে ডাক্তারের পূর্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হলেও কঠিবিরুদ্ধ। যা হোক, সোজা কথা হচ্ছে, ডাক্তারের কৃষ্টিতে লাখ লাখ যুগের অকপাত হতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও একথা জানে। ডাক্তার যে সে তো সেদিন জন্মেছে ; কিন্তু বন্ধু যে সে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো-এক কালে ছিল না, আর কোনো-এক কালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পংক্তি মনে পড়ছে—

এক দুই গণইতে অস্ত নাহি পাই,

রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই।

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাশ্ব্য নেই।

অতএব, কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের

চার দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীয়া চিরকাল
তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে—

ইতর ভাপশতানি যথেক্ষয়া বিতর তানি সহে চতুরানন ।

অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনঃ শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ ।

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে হানিবে, অবিচল রব তাহে ।

রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে ।

সৃষ্টি

আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব বলে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনেতে পেলুম,
আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ।
খাঘাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যাহের সমস্ত
ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার
রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদায় কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে— এই ট্রায়-চলাচলের,
কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বরবধুকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অস্তঃপুরে,
রসলোকে।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে, বরবধুরাও তুচ্ছ; কেই বা জানে তাদের
নাম, কেই বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু, রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী।
চারি দিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের
বরণ করে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এইজন্টেই প্রতিদিন
তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান; তাদের মূল্যের
সীমা নেই; তাদের জন্টে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল
তাদের আশীর্বাদ করবার জন্টে উপস্থিত।

এই বরবধু, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা-মহারাজার চেয়ে কম সত্য নয়,
সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন করে রাখে। কিন্তু, সেই নিত্যপরিচয়
প্রকাশ করবার তার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো-না কেন, এক কালে তপোবনে থাকত
একটি মেয়ে; সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্ততার কুহেলিকায়
ঢাকা। তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর-একদিন রাজা তাকে ত্যাগ

করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাই তো রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'সকুংকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ।' রাজার সকুংপ্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্চিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে দেখবার, মনে ক'রে রাখবার, এত সময় আছে কার। কালকর্ম তো খেমে থাকে না, কেনাবেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু, একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক'রে দাঁড় করালে কে। সেও একটি কবির বাণি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাশাজের করুণ রাগিনী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্তন হয়, সে কি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র ব'লে তার মূল্য। তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাণি কি পাঞ্চজন্তুর কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত। সেই রাখালবেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে। সে তো কবির বাণি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে। তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্জাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু, সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিড় যে অথও সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো-জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, বড় দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কত দূর, এমন-কি দেবদ্বিজের তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাহিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এইমাত্র তাদের মহিমা; সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দৌহে মিলে যদি দশাবতারের স্ননিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য অর্থ উদ্ঘাটন করতে পারে, তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্যকলার রথে তুলে তথ্যসীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে মূল্যবান্ হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির নাম পাঁচ-দশ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই

দামকে আমরা দাম বলেই মানি নে—সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই-যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি। এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্বরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে; আপন সত্য ঐশ্বর্যকে হাট-বাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে; তার নিকড়িয়া ধনকে নিকড়িয়া বাণির সুরে গঁেথে রেখেছে। আপনাকে আপনি বারবার বলেছে, ‘ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।’

আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা। বিশ্লেষণ ক’রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায়, যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ডাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাণির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম, বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই; এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, ‘আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।’ এ কথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না, নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অন্ত-সূর্যচ্ছটার সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজসজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্তে। আমার জন্তে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই— আমি সত্য, তাই আমার জন্তে সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক’রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক’রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জল ক’রে আছ্রানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, ‘আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক’রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক’রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক’রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জ্বলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি করে আলো জ্বালতে হবে যে-আলো নেবে না, মালা গাঁথতে হবে যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।’ মানুষ এমন কথা সাহস করে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বরবধুর সত্যস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী তো বলে, অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোহলায়মান ; বলে, যা দেখ কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতিনিপুণ বলে, ঐ-যে ললাটে ওরা চন্দন পরেছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতর আছে মাথার খুলি। ঐ-যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক করে তার কোনো জবাব দেয় না ; কেবল তার ধাত্বজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বল, দাঁতের পাটি বল, যত কালই টিকে থাক-না কেন, ওরা মিছে ; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের স্নগন্ধলিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জল করে ধরে বাঁশি বলছে, 'সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।'

বুঝলুম। কিন্তু, বিনা তর্কে বাঁশি এতবড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী করে। এ কথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে সূক্ষ্মস্পর্শ এককে চরমরূপে দেখানো। সেই একের জীবনকাটি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চিরজাগ্রত চিরসজীব স্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে ; বরবধু বললে, 'আমরা সামান্ত নই, আমরা চিরকালের।' বললে, 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃতলোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।' বরকনে আজ সংসারের শ্রোতে ভাসমান ধাপছাড়া পদার্থ নয় ; আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হল সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সংগীত কোনো-একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক-না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জালিয়ে ধরে তখন সত্য প্রকাশ পায়।

আজকের সানাই বাজনাতেই এ কথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই-একটা তালের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির হাটে বাজছে, সুরটা খেলো সুর।

বার বার পুনরাবৃত্তি, 'তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছান্নাহীন মধ্যাহ্নরৌদ্রের মতো। যত ঝাঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সংগীতের আয়তনটাকেই বড়ো করে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ, সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে— তারই 'পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা-আপন সংঘের দ্বারা আপনাকে আড়াল করে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্মে সকল কলানৃষ্টিতেই সরলতার সংঘ একটা প্রধান বস্তু। সংঘমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংঘম। সেটাই হল একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহু অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হতে থাকে অস্বর্ধায়ী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্ছে, অতিমাত্রায় ধন জিনিসটা মানুষের বাহু অসংঘম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা ঋণাত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যে এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহাবচিহ্নের মধ্যে ছড়াছড়ি করে নষ্ট করে। জীবন-বাণিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়— তানের অঙ্কুরত কসরত, ছন-চৌছনের মাতামাতি, তারস্বরের অসহ দাস্তিকতা; এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংঘের মধ্যে দ্বারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জড়লের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে দেখো'। কেন দেখব। জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু, জগতে নিজ্ঞান যেমন অবস্থাকে খুঁজে বের করে বলছে 'এই তো সত্য', রূপজগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে 'ঐ তো আমার সত্য'। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কসরতকে বলি 'ধিক'।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনও তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুশি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অল্পশূলরোগীর সেবার জন্ত সেই মেয়েদের 'পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে দ্বারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে— তাদের মুক্তি নেই। কারণ, রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। দ্বারা

কর্মা গণনা ক'রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা পড়ে কবরস্থ হয় ।

কলানৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্তা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা ; অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা ; ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা, এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না— এই অনুশাসন গ্রহণ করা । সৃষ্টির তত্ত্বই এই ; জগৎসৃষ্টিই বল আর কলানৃষ্টিই বল । রূপকে মানতেও হবে, না'ও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে । রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন ।

এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল—হৃদয় করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল । এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে । তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন । আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই । আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্তমাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের ; এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয় । মাংসপেশী খুবই দরকারি, তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুখ হ'লুম কখন । যখন আমাদের সমস্ত দেহের সংগীতকে তারা গতিলীলার প্রকাশ করে দেখালে । মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেন, 'তোমাদের প্রশংসা আমি চাই নে ।' কেননা, সৃষ্টির চরমতা কোণলের মধ্যে নেই । তিনি বলেন, 'জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্ররূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জানলে ।' তবে কী জানব । 'আনন্দরূপে আমাকে জানো ।' ভূস্তরসংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে । মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন । কিন্তু, উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই । এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড । বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস । তার পরে কারখানাঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সবুজ নীল সোনার ধারার সমস্ত ধূয়ে মুছে দিয়ে, তারার মালা মাথায় প'রে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন ।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল । পৃথিবীর যে-সভ্যতা তাল ঠুঁকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালী লেপে দিচ্ছে, সেই বেআক্র

সভ্যতার 'পরে সৃষ্টিকর্তার লজ্জা দেখতে পাচ্ছ না কি। ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্খলি দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্কনিকে ব্যঙ্গ করছে। উল্লেখ্যশক্তির এই দৃষ্ট আত্মসত্ত্বিতা আপন কলুষ-কুংসিত মুষ্টিতে অমৃতলোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানবসংসারে আজকের দিনের সব-চেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ অপমান এই নিয়্যেই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্থানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়—যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্মে সমগ্র মানুষের তপস্বা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্মে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্মে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্মে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের সুখের অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শাস্তিরূপ আপন স্নানর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য নিয়েই সে দস্ত করছে। কিন্তু একালে তার লজ্জা-হীনতাকে, তার দস্তকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় নি— 'পৃথিবীতে স্নানরের বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেস্বর লাগিয়ে না; জগতে আনন্দলক্ষীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথাই বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, 'বরবধু, তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অগ্র সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দু-লাখ টাকা ব্যাঙ্ক

জমছে বলেই যে সত্য তা নয় ; যে-সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর, চেক-বইয়ের অঙ্কের মধ্যেই নয় । সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে— গৃহ সজ্জার উপকরণে নয় । সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য ।’

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দভঙ্গ, তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম । এমন সময় বাজল বাঁশি । ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে বলে পাঠালেন, ‘ব্যাখ্যা করেই যে সব কথা বলা যায়, আর তপস্শা করেই যে সব সাধনার সিদ্ধিলাভ হয় এমন-সব লোক-প্রচলিত কথা কে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস কর । ব্যাখ্যা বন্ধ ক’রে তপস্শা ভঙ্গ ক’রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হল অখণ্ড । সে তৈরি-করা জিনিস নয়, সে আপনি ফলে-ওঠা জিনিস ।’ ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্তেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন । আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে । সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিয়কম তাই দেখিয়ে দেবার জন্তেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন । বলেন, ‘এ জিনিস লড়াই ক’রে তৈরি ক’রে তোলাবার জিনিস নয় ; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ’ড়ে ওঠে না । সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক’রে তুলতে চাও, তা হলে রাতদিন বাঁও-কষাকষি ক’রে তা হবে না । তদ্বার এই খাঁটি মধ্যম-পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অস্তরে লাভ করো, তা হলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে ।’ মেনকা উর্বশী এরা হল ঐ তদ্বার মধ্যম-পঞ্চম সুর— পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা । সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের । স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও ? তাই তোমার তপস্শা ? কিন্তু, স্বর্গ তো পরিশ্রম ক’রে মিল্লি দিয়ে তৈরি হয় নি । স্বর্গ যে সৃষ্টি । উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে । তুমি মুক্তিকামী মুক্তি চাও ? একটু একটু ক’রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না । মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয় । মুক্তি যে সৃষ্টি । মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে । বিধাতার রক্ত আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে— সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক’রে সম্পূর্ণ হয়েছে ।

বুদ্ধদেব যখন বোধিজ্ঞানের তলার ব’সে কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন তখন তাঁর গীড়িত চিত্ত বলেছে ‘হল না’, ‘পেলুম না’ । তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন । যখন সূজাতা অন্ন এনে দিলে । সে কি কেবল দেহের অন্ন । তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল— সেই পারস-অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল । ইন্দ্রদেব কি সূজাতাকে পাঠান নি । সেই সূজাতার

মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের যে-সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি 'এক পুত্রের প্রতি মাতার যে-প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার' ? অর্থাৎ, মুক্তি শূণ্যতায় নয়, পূর্ণতায় ; এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায়, তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশুখৃষ্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্তিতে কোথায় দেখেছিলেন। ইহুদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মার্খা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্খা ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্যনিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্মনিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধতৈল খৃষ্টের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। সকলে বলে উঠল, 'এ যে অন্ডায় অপব্যয়।' খৃষ্ট বললেন, 'না, না, ওকে নিবারণ কোরো না।' সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারও কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়। কিন্তু, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যে ললিতকলায় নয়, তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে— তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। যিশুখৃষ্ট ম্যারির চরম আত্মনিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন ; তখন তিনি নিঃস্বের অস্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন : ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশিত হল। এমনি করেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণসংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক— লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তুম্ব নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দস্তে অভিভূত না করে ; কেননা সে সংগ্রহকর্তা নয়, নির্মাণকর্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্তা।

সাহিত্যধর্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজনে বাহির হন রাজকন্টার সন্ধানে। বসন্ত রাজকন্টা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্টার নাড়ীনকত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্টাই সমান দরের মানুষ— ঘুঁটেকুড়োনির সঙ্গে রাজকন্টার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রক্সিজিঙ্গাসা।

আর-একদিকে রাজকন্টা কাঞ্জের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, স্ততো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রক্স; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন— অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি— তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্তে না, ধনের জন্তে না, রাজকন্টারই জন্তে। এই রাজকন্টার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পনাতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ঘণ করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন।' সে বলে 'তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্টার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্তে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমার বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ঘণ চলে; কিন্তু, যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্ম সঙ্কে বলেছেন, তাকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দ-বোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না।— আমাদের এই বোধের স্ক্রুধা আত্মার স্ক্রুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের স্ক্রুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আগ্নিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে।

কাঠা-বিঘের দরে তার বেচাকেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে অঞ্চল আকাশে তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নিচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানবকীটও আছে, আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন—

অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনম্

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু, রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপবিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অহুসারে। অগ্নদের ব্যবহার অগ্নরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ হৃন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে ছুঁধের থেকে যে নবনী মন্বন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু, রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবদ্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আটকে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।

অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিক্রম। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা— তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাবায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেতসংকারে বাজতে থাকে 'অলম্'— অর্থাৎ, 'বাস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি ষথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ

সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু ষথার্থ মানুষ 'সাথে না মিলল এক'। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে ষথন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন ষথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা, ছন্দ অলংকার। ষথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অষথার্থ। কবির চিন্তে, রূপকারের চিন্তে, এই ষথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ বলে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক করে দেখাতে পারেন। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকৈ দেখি সেই জিনিসই সার্থক। এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটা পদ্ম আমার কাছে স্থনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈজ্ঞ ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁত-গুলো আঁতকে ওঠে— তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়েকে বরণ করে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাঙ, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের ষথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেয়েছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজনেমঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা— কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিষ যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগত তা হলে স্কন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসিফুল শর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজায় ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্ত গেল; কেননা গোলাপজায় নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লালিত। যে-কবির সাহস আছে স্কন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্রামজম্বুবনাস্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভকণ্ঠে বসন্ত দেবতাদের বিচারে মদনের ভূণে আমের

মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতের অনটন ঘটে না বলেই আমার প্রতি দেবতাদের আহ্বারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের স্তম্ভরগলীলা আকাশে পাখি ওড়ায় চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে—ওকে বাহনভুক্ত করে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না, নির্বাচনের সময় রুই কাতলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোড় কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্যকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচু গাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু, বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচু গাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাণবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেগু বন বলে গামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে কুর্বাচ ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত করেছি, কিন্তু কুর্বাচ ফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ কথাটা বলা দরকার, যুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিসটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ করে দেখি নে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন করে রাখে। বৈঠকখানা না হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে, তার উপরে নিজের সাধ্যমতো সর্বকালের ছাপ মেয়ে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাঁচাই করেছে; তার ছায়াই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমার। সে যে খায় বা খাওয়াসকল করে, এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে, এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলংকৃত।

জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মানুষের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক, সাহিত্যে

ও অন্য কলায় ব্যক্তির ভাবে ছাড়া প্রকার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। মানুষের আহাের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকে অমরাবতীতে স্থান দেয় নি।

স্ত্রীপুরুষের মিলন আহাের ব্যাপারের উপরের কোঠায়; কেননা, ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীরবিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রীপুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাটুকু পশুধর্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু, সে হল বিজ্ঞানের কথা; মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুঃস্বপ্ন ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও বিজ্ঞানের; সংসারে এ কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অশুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্টিকে অলংকৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উদ্ভেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উদ্ভেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিকৃত করে দেয়।

যুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না; দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্রশৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্যসূর্য তারই কলকলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু, সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে যুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল; ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য, তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সত্যকে অপকৃপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াঙ্গাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিষয়ত্বই হচ্ছে তার পকৃপাতধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উচ্ছত। আজকালকার যুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজ্যটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুদ্ধ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আঙনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, বেদিন

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাষ্ট্রের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম তার প্রশংসাক্ষিনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আক্রতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিতাপদার্থ; তুলে যান, বা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মাহুষের রসবোধে যে-আক্র আছে সেইটেই নিত্য; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি ভাল ঠুকে বলছে, ঐ আক্রটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলঙ্কৃত্যই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাণ্ডট-পর্য গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলার আবির্ভাব নেই, গুলাম নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাক ক'রে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অব্যবহিত মালিন্যের উন্নততা মাহুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্যকারণ বহুতত্ত্বে বিচার। কিন্তু, মাহুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতার সকল মাহুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বে এ ক্ষেত্রে অসংগত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজনপূরীর দল যখন মাত্লামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত স্বরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, ষথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়; কঠোর অক্লান্ত উত্তেজনার খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রুঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাছুরি দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু, ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যিকতার নয়।

উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্ভ্রান্তি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলঙ্কৃত কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে, সে-দেশের সাহিত্য অস্ত্রত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাভ্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু, যে-দেশে অস্ত্রের-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লঙ্কৃতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন,' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।'

১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক'রে তোলা, যেখান থেকে দাবি আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহু কালের আর বহু মানুষের কানে কথা করেছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি ক'রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের আধা'র ব্যাপারী বলব না, স্তূতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক-না, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে-আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্মেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক

রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য পায় না। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের অগম্য-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বঙ্গের সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়; সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ষে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু, মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় ক'রে থাকে, যাদের ফরমাশ সব-চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত কণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গল্পের দাবি অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সব-চেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে ষে-আলোটা ল্যাম্প-পোস্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

ষে-লেখকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তা হলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তা হলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক'রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা ষে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ যুরোপে সকল সময়েই সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গল্পের ফরমাশ যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিয়লজির গোল্ড্ মেডালিস্ট্ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধবুনা দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না; মধ্যাহ্নে পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন কীণ হয়ে আসে তখনই অজুতের প্রাহুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কঙ্কাকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াকে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব'লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে; কেননা, বা-কিছু সহজ তাতে তার আর সানায় না। ষে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দসম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর সেই শক্তির কীণতার উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে।

তখন মাত্লামিকেই পৌরুষ বলে মনে হয়। প্রকৃতিহকেই মাতাল অবজ্ঞা করে; তার সংঘর্ষকে হ্রস্ব মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিনালিটি। সাহিত্য যখন অক্রান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে ওরিজিনালিটি। যখন সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল করে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিনাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল ঘাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পান। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পানকের মাতুনি— এতে মাঝিগিরির দরকার নেই— এটা তলিয়ে-যাওয়া বিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ভিগ্বাঙ্কি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা যুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িঞ্জ্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু, তা নিয়ে শকা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুকি, সর্বনাশ হল বলে।

যুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-ষে বিহ্বলতা ক্রমে ক্রমে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন করে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্তঃস্থ নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র-মানা ধাত। এইরকম মাহুঘরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি পরে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাওড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাওড়ি হয়ে উঠে নিজের বধুর পরে শাসন জারি করে যেমন আনন্দ পান, এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মাহুঘকে নিজেদের সুলভ বলে ভারতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপর ওয়ালা রাশিয়ান হেড্‌মাস্টারদের কড়াবিধান জারি করে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেড্‌মাস্টারের গদগদ ভাষার অর্থ

কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাগ নেই, কেননা সেই হল আধুনিক কালের আশুবাণ্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে কণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাহুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সস্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রুঢ়তাকে বলে শৌর্ষ, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকতে তার দৈন্ত বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাধিবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আক্ষালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্তান্ত মকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইক' এই আক্ষালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম উপার্জনও করেন, স্বখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের বাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই

কাল-সমস্যার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউন্ডের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভার এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্তেই অগুণ্ট লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ, ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জন্তেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্নীত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে একজনে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিস। কিন্তু, সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোনো-কিছুকে কেয়ার করি নে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে সব সংস্কার জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো, প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না ছুঁতেই তারা কন্‌বন্‌ ক'রে বেছে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীতশয় রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল এক আয়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বন্দন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা আগিরে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে আয়গা পাবে না, এ কথা বলব না কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহত্তের, ভালো ও মন্দের, কাকর ও পদ্যের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরার কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যারা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই; তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু, কিছুই সঙ্গে কিছুই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো

সমান দাবের হয়ে ওঠে। কেননা, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা— খণ্ড দেশকালপাত্রে মধ্যই তাদের মূল্যভেদ। আমি এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমার অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারি নে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম এবং দিয়ে যদি বাহা বা পাওয়া যেত, তাহলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালোরকম বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে মানুষকে নিম্নত যে-প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিজ্ঞানশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয়, তা হলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহংকার করতে পারে। এই রকম সস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ্য সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে দুর্বল করাই হয়। বীরসাধা সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্য ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে— বিশেষভাবে, যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এইরকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তা হলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিরা সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'— এটা তরুণের ধর্ম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে; সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করে ও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু, যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য। ভাবাকে মানি নে যদি বলতে পারি

তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্রান্সিউজ জাহাজ

২৩ আগস্ট, ১৯২৭

সাহিত্যবিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত ; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই ; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অমুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা স্পষ্ট, কেউ-বা অস্পষ্ট। অস্তুত, যে-মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয় ; বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে স্পষ্ট তাই ব্যক্তি ; জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লঙ্ঘিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ—সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রসোত্তম নয়, তমোত্তম নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে, অসংখ্য জিনিসকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই নে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিশ ইন্স্পেক্টর বা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিশ ইন্স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু, সাহিত্যরচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সং বলে নয়, সস্ত্র রত্ন বা তমোত্তমাবিহিত বলে নয়,

তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেয়েছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এইজন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের হুঁহু কতব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সজ্জ করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকল্লারশোভিত সরোবর; যুধীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তঝড়; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষ দাড়িষ স্নেহের বাধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনার ও অসুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝাঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু, ভালো মন্দ লাগাটাকুচি নিয়ে; এর উপরে আর-কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্যরচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অন্ধরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই; নিজের অনিবার্য কর্মফলের উপরে জোর খাটে না।

কচির মায় যখন খাই তখন চূপ ক'রে সজ্জ করাই ভালো; কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই কচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু, বাইরে থেকে যখন আসে উদ্ধাস্তি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা। বাংলাসাহিত্যের অস্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনকার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে; কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউলকবি হুঁহু

ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায় ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্গম বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর-সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মাহুষও ঘরে ঘরে বরমালা লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কিনা কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্গম করতে যে সমজদারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এইজন্তে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মাহুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্যাদা দেওয়া, ধনের মর্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নিচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন-কি, এখানে বর্ণসংকর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না; তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দির প্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডুরা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে ঘবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডুরা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে; কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিছবি দেখো, যদি রূপবাস্তুরায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলকলজন হয়ে গেল। মাহুষের মনে মাহুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়— তাতে চিত্রের নির্ভীকতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, ধ্বাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাকু আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুষ্ক আকারে, তার উপরে রসের

বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মস্তব্য শুনেছে যে, দাশুয়ারের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশ্বক স্বাদেশিক।

এটা অঙ্ক অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, ‘কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।’ অবস্থাবৈশিষ্ট্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক— ওটা হল ঋতুতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু, যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাহিত্যিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজনিকতা হল যুরোপীয়ত্ব— এই বলে সাহিত্যে খানাতল্লাশি করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজনিকতার প্রমাণ বের ক’রে কাব্যের উপরে একঘরে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাভে রাখেন, কাউকে জাভে ঠেলেন, তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ার এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্ভর্তী এশিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লক্ষিত না হয়। কারণ, যে-কোনো দানের মধ্যে শাস্ত্র সত্য আছে তাকে যে-কোনো লোক যদি স্বার্থভাবে আপন ক’রে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যই তার আপনায় হয়। অঙ্করণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

বর্তমান যুগে যুরোপ সর্ববিধ বিজ্ঞান ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারি দিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় যুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিন্তাজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। যুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু, সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়— তাকে স্বকীয় ক’রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশাত্মভূতি, আমাদের সাহিত্য, যুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাট্টোজের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে যুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক’রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবন্ততা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আনুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যারা নিশ্চিন্ত তাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি,

সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরও একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উদ্ভেদনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে দলপতিদের চাটুজির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারও কারও লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমু মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কিনা—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা। মানবপ্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী করে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে, সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রদেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আলোচ্য এই—কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাৱশ্যক নয়; কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অঞ্চ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে বিভক্ত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষণ সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম

ক্রোধ অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায় সন্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারানয়, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অশাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্তুকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কামপ্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে-পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইচ্ছাজালে আছে। সন্দেহে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেহের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেহের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সবেও জোর ক'রে বলতে হবে যে, সন্দেহ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যে-ভাবে সেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে গুর প্রাণের লাভণ্য; এইখানে সন্দেহের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অস্তুর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেহে জাফ্রান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অক্লপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা গুর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাংস্কৃতিকতার প্রমাণ হয়; আর রাস্পবেরি গুস্বেরি বিলাতি, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়, পরের তুষ্টির চেয়ে গুরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব গুরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের

অনুকূল কথা হতে পারে; কিন্তু, এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসংগত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই— সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকূল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার্ন বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অস্বস্তি করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঞ্জি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্নস্ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্, কোলরিজ্ শেলি কীটস্।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরন্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে— রচনার নিখুঁত রীতির ফোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্নস্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকঙ্কারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন

ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেলালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, 'ধিক্।'

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-শাঙা ব্যক্তিগত মজিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এতিন্ধরা রিভিযুতে যে-তর্জনধনি উঠেছিল সেটা তখন শাস্ত। বাই হোক, আমাদের সকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দোড়। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় স্নানর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে-আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরূপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিখাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের অন্ত ব্যাধে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল মলিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না; চীনাংগুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কর্তব্য মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়,

তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইঙ্গিতমূলে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ধরের রসের আতিথেয়। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যধারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সম্বন্ধে জাগিয়ে রাখতে হয়; সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে ঝুঁকি ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিত্তিকের প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেন্দরায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা। ক্রমে ক্রমে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়; কিন্তু সেটা প্রকাশে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জ্বিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা স্বর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনকত্র বিচার ক'রে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এই গুলোকেই গৌণ জানতুম, মাঝাকেকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল; লক্ষ্যের যে-আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উবা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা স্করণ। আধুনিক ছঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রোপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্তেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে-আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জ্বিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই

মাহুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মাহুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাঝে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়েঁ।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়স্বজনের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসম্বন্ধিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিক্রমের মূল্যে তাকে বাছাই করে না, ব্যক্তিগত অহুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিক মতো কী সেইটেই বিচার। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থার যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব-চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চূকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্তে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্তে পাঁচিলের উপর রুঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all। বলছেন, 'আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, এ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হত সমুদ্র, তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বলতে পারত, ওটা দস্তরমতো কবিরানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তরমতো কবিরানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কারদা।

কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার

দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, ষথাস্থানে কবিপ্রেমসীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেমসী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যে-হাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি এ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্তে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা বা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে; সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্ত্র চাই। 'জ্ঞানে অধ'ভোজনং' বললে প্রায় বারো আনা অত্যাঙ্কি করা হয়। একটি আধুনিক মেয়ে কবি গত যুগের সূন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেধাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না—

তুমি সূন্দরী এবং তুমি বাসি
 যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
 বাজছে সেকলে একটা সারিন্দি ষন্ত্রে।
 কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
 যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
 তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
 ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
 তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
 ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাধাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
 তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
 তোমার ঐ মিলে মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
 আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পরসা
 তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
 ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
 তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পরমাটার দায় কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে

বেজে ওঠে হালের সুরে। সাব্বকালের ঘে-মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন স্তনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাঁচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা— like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আগ্রহের কোনো কারণ নেই, না ধরিদার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর স্নইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না'। 'দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজরা পোণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না; বলে উঠল, 'দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর।' এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ভিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাতে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বলছেন, 'তখন I was mildly abashed।'।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ভিন মাছকেও ; একই ভাষায় বলতে কুষ্ঠিত হয়ো না, কী সুন্দর । এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা ; এর পঙ্ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না ।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা । এইজন্তে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝাঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয় । কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্তে ।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল । চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্তে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে । সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা ; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, ষাথার্থ্য । চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে । নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় ‘আমি দ্রষ্টব্য’ । তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা । এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত । অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব’লেই তাকে স্বীকার করতে হয় । যেমন আমরা ময়ুরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই ।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর ; কেউ কাজের, কেউ অকাজের ; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব । সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই-রকম । কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই ; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয় ।

এইজন্তে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে গাবেক-কালের কৌলীন্তের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই । এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয় । এলিয়ট লিখছেন—

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার বাস্তায় সিঁচ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল ।
এখন ছ’টা—

ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল

বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে

পোড়ো জমি থেকে কুলমাখা শুকনো পাতা

আর ছেঁড়া খবরের কাগজ ।

ভাঙা সার্শি আর চিম্নির চোঙের উপর

বুড়ির ঝাপট লাগে,

আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,

ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর ।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়াল কাদামাখা সকালের বর্ণনা । এই সকালে
একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কবলটা,

চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,

কখনো কিম্বা, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে

হাজার খেলো খেলার ছবি

যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি ।

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies

That fade behind a city block,

Or trampled by insistent feet

At four and five and six o'clock ;

And short square fingers stuffing pipes,

And evening newspapers, and eyes

Assured of certain certainties,

The conscience of a blackened street

Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নামা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়াল নিভাস্ত
খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত আত্মের
ছবি আগল । বললেন—

I am moved by fancies that are curled

Around these images, and cling ;

The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিকল না। এইখানে কৃপমত্বকের মক্‌মক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতাস্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।

দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো

ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিকৃতি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অহুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না'ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লক্ষ্মান অটুহাস্তকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে— এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুগঞ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানায় বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলক্ষি, চৈতন্যের নূতন চাক্ষু্য। এই অবস্থাটাকে রোমাটিক বলা যায়। সস্ত-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বস্থিতিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অস্তরে যেটাকে চার বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে; কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লক্ষ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও

অস্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে ; মনে করে না, গৃঢ় ব'লে কিছুই নেই ; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত যুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুগুণপ্রচলিত স্বত-কিছু আদব ও আক্র তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছায়ার হয়ে গেল ; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ঘবিদীর্ণ হয়ে গেল ; মানুষ যে-সকল শোভন ব্রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ-দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল ; বিশ্বনিম্নকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুংসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্রবর্তনিত একটা ব্যক্তিগত চিন্তাবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শাস্ত নিরাসক্ত চিন্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি ভাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইন্ফুরেঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইন্ফুরেঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহু। ইন্ফুরেঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদুত্তভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিন্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিন্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাস্তভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক ; তাঁর ছিল বিশ্বকে সজ্ঞ-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।

প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তর।

যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—

সে অগৎ কোনো মাহুষের না।

পীচগাছে ফুল ধরে, অলের স্রোত যায় বয়ে।

আর একটা ছবি—

নীল জল...নির্মল টান,

টানের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।

ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল ;

তারা বাড়ি ফিরছে রাতে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।

এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।

টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,

পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে

আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধুর কথা—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।

আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।

তুমি এলে আমার প্রিয়, বাশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,

কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

টাঙ্কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।

আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।

তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দর।

এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,

অঙ্কার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,

তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।

পনেরো বছরে পড়তে আমার ভূবুকুটি গেল ঘুচে,

আমি হাসলুম।...

আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—

চ্যাটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।

পঞ্চম মাস এল, আমার আর সঙ্গ হয় না।

আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্রাওলার চাপা পড়ল—
সে শ্রাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় মান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাওফেঙ শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের স্বর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা
অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব
নেই। স্টাইল বেকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জ্বিনিসটা আধুনিক হত। কেননা,
সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব
সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন
ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের
বড়া ভাজতে। কার জন্তে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুটকি।
সেকালে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো
হয়েই থাকে।' 'অন্তটাও তো হয়।' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু
দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের
বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা
পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিলা।
তাদের মনটা পাঠককে কহুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং
দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অস্থস্থ,
অস্থখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থার বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিগতভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে
নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঁচ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্ত করে; বলে, আসল
জ্বিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঁচখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া
কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। ষথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খান্সামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেটিস্ট্র এল, সে তার যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অধোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অধোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না— প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা বলে বাহাছুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন

পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।

ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,

ছিপছিপে যেন রাজপুত্র।

সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—

কিন্তু যখন বলতেন ‘গুড্‌মর্নিং’, আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।

চলতেন যখন বলমল করত।

ধনী ছিলেন অসম্ভব ।
 ব্যবহারে প্রসাদশূণ্য ছিল চমৎকার ।
 যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
 আহা, আমি যদি হতুম ইনি ।
 এ দিকে আমরা বখন মরছি খেটে খেটে,
 তাকিয়ে আছি কখন জলবে আলো,
 ভোজনের পালার মাংস ছোটে না,
 গাল পাড়ছি মোটা কটিকে—
 এমন সময় একদিন শাস্ত বসন্তের রাত্রে
 রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
 মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি ।^১

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে । কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি । সে হচ্ছে এই যে, যা সুন্দর ব'লে মনে হয় তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে । যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী । যারা সেকলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন । যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে । যুরোপীয় সম্রাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নিচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্ছে । যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরসের কদর্ঘ সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চটুকা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে । বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি ধারে ধারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া । কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অমুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে । কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া— এমন কথা সে খুঁশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা ?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিভ্রম স্বাভাবিকতার জোর নেই । সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে । বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়,

^১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাত্তে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হল, কিছু ক্রটি ঘটতে পারে ।

গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো ষত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ করে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আত্ম ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলা সেটিমেন্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি আততায়নার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর তবে এডওয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাস্ত নয়। 'সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; যুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পার নি।

১৩৩২

সাহিত্যতত্ত্ব

আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল-মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি ষত প্রবল হয় অস্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার উৎসুক্য অর্থাৎ বা আমার চেতনাকে আগিয়ে রাখে, সে ষতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশি— তা সে হোক-না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক-না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে আনছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শান্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এঁকেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে-এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়; উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর-কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। 'আমি আছি' এবং 'না-আমি আছে' এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে; অন্তর-বাহিরের এই সন্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমার সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু, এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনে সত্যোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক, এ আলোচনাটা আপাতত থাক, পরে হবে।

আমাদের জানা হু-রকমের, জানে জানা আর অহুভাবে জানা। অহুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্ত-কিছুর অহুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অহুভব করা। সেইজন্মে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অহুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রাতদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতার, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তার ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ— সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের করুক তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাবমোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে; সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সঙ্কানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই-চাই'য়ের হাট বসে গেছে, এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাই নে', অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিপুল সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে-রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলক্ষিত তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অস্ত্র কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।

লোকে বলে, সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে-কথা বিচার করে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্টসকে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই-সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই-সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মূখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুবসার, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য, বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে; সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ বা বহু তথ্যকে আবৃত্ত করে অখণ্ড এক।

উচ্চ-অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌধমা, যে-একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু

জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অহুভূতির ; তাতে বিস্তৃত আনন্দ । কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের যুক্তি । এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয় নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে । হয় নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্বসাধারণের অগোচর । যে-ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহু লোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠে নি । যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে-ভাষার সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয় । অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে । যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনার প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সৃষ্টিত স্মৃতিসংগতিকে অবলম্বন করে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত । কল্পনাদৃষ্টিতে তার অগপ্রত্যয়ের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে । সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর । যে-মানুষ তাকে, যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, অহুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অহুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অহুভব করতে পারে । কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্ভব-তত্ত্ব এ জাতের নয় । এ-সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয় । কিন্তু, সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্তর-মহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস ।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ । সৌন্দর্যের রস আছে ; কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে । সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে এখানে, যেখানে সে আমাদের অহুভূতির সামগ্রী । অহুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই । রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অভিক্রম করে । রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না । এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা ।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ । সে আপন অহুভূতির অন্তে অবকাশ রচনা করেছে । তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই । ঘড়ায় করে সে জল আনে, এই জল আনার তার নিত্য প্রয়োজন । অগত্যা বস্তুর দৌরাণ্য্য তাকে কাঁধে করে মাথায় করে বইতেই হয় । প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে

তাহলে ঘড়া হয় আমাদের অনাখ্যায়। মানুষ তাকে স্কন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্ত সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু, এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারি দিকে কাঁকা এনে দিল। যে-ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ যায়, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু, বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা, বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেন্দ্রা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ স্কন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহার ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চার দিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণশিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, তাপ নিয়ে, চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি; এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না; বার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্রামলতা, তার হিম্মোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলার আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য— যে-সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অসম্ভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলার উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি; আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই-সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিক্রটি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তর সন্ধে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়মুহূর্তিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সন্ধে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অমুহূর্তির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অমুহূর্তিকে প্রকাশ

করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাশঙ্ককতাকে সে বিশ্বৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায় প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অমুভূতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিঙ্কিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অমুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি ভীর্থযাত্রা করতে বেয়োর সাগরসংগমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তব্ধে নয়; লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্রামল যেখানে নবদুর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অমুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্য। যেখানে অর্থে চাই অর্জন করতে সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও সংকোচ নেই। কেননা, সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, 'আমি ধনী' এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গি সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়; কিন্তু, যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি তখন তহবিলের সীমিততা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারহু, নয়ন না তিরগিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যাঙ্কি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিগত অহুভূতির মধ্যে কণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল। 'পাষণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' বস্তুজগতে এ কথাটা অত্যাঙ্কি, কিন্তু ব্যক্তিগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম করে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌঁছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু, সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।

উধ্ব-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে 'ধূমজ্বাতিঃসলিলমক্‌তাং সন্নিপাতঃ' মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যাঙ্কি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্বচনীয়তার পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অহুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এইজন্যে সে যখন বলে 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে', তখন তাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে। এইজন্যে সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা নয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক'রে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দে ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়। তথ্যের অগতে ব্যক্তিবস্তু হলে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের ভাগিদ, সৌন্দর্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তি-পুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তার ছিল বৈষয়িকতার দার। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার; প্রবল উদ্বেগ, প্রবল উচ্চম ছিল তাদের বেঁটন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দার ছিল না, সৌন্দর্যের অত্যাঙ্কি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে—যেমন ক'রে আমরা গল্পমবোধের পরিভূষ্টি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিত্তে পাঁচটা স্ত্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ার, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিবস্তুদের যে-পরিচয় চিরকালের

দৃষ্টিপাত সন্ন, পাথরের রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সখ্যনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক, সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে-বাওয়া নৌকোর সেই সারিগান—

মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,

আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, যে-গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে—

Listen Eugenia,

How thick the burst comes crowding through the leaves.

Again—thou hearest ?

Eternal passion !

Eternal pain !

পূর্বেই বলেছি, রসমাত্রেরই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে, যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে, ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য মনে করি তার কারণ, তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হলে সেটা দুঃসহ হয়। এইজন্মে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সম্বন্ধে সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মাহুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয়, প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্তে নয়, ভয়-বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্তে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হাতে দেখা যায়; কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না; তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায়, হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানায় এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহেতুক আনন্দ নিন্দুকদের;

নিজের কোনো বিশেষ কৃতির উদ্ভেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে, তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করে নি, তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলে-বলে নিন্দাসাধনার ভৈরবীচক্রে বগে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদম্ব, কিন্তু তীব্র তার আস্থান। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের গুণ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অহুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এইহেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্নত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুবাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অহুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনার রামচন্দ্রের নির্বাসন, মহুরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, এ কথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে; ভিড় জমছে কত; আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগুণের প্রবল আত্মাহুভূতি। বহু জল যেমন বোঝা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি যা দেয় না চেতনার, তাতে সত্তাবোধ নিশ্চয় হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলাম। বলেছিলাম, আমার অন্তরতম আমি আলস্তে আবেশে বিলাসের প্রসরে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এত কাল আমি রেখেছি তাকে বতনতরে

শয়ন-পরে ;

ব্যথা পাছে লাগে, দুঃখ পাছে আগে,

নিশিদিন তাই বহু অহুরাগে

বাগরশয়ন করেছি রচন কুসুমধরে,

দুয়ার কথিয়া রেখেছি তাকে গোপন ঘরে

যতনভরে ।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরণে

আবেশবশে ।

পরশ করিলে আগে না সে আর,

কুসুমের হার লাগে গুরুভার,

ঘুমে আগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;

বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে

আবেশবশে ।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নৃতন খেলা

রাজিবেলা ।

মরণদোলার ধরি রশিগাছি

বসিব হৃদনে বড়ো কাছাকাছি,

বন্ধা আসিরা অট্ট হাসিরা মারিবে ঠেলা,

প্রাণেতে আমাতে খেলিব হৃদনে কুলন-খেলা

নিশীথ বেলা ।

আমাদের শাস্ত্র বলেন—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ।

সেই বেদনীর পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয় ।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই ঠাকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পাসে ঈশালিটিকে । আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অহুত্বুতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও । তখন কী হয় । মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীর পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে । জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সন্তাবোধের জ্ঞানতার সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অহুত্বুতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে আগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে 'আমি আছি' । বিরহের শূন্যতার যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, 'অয়মহং ভোঃ ।' এই-যে আমি আছি । সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, 'এই যে আমিও আছি ।' দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে । সংসারে

‘আমি আছি’ এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তা হলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, ‘আমি আছি।’ ‘আমি আছি’ এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে। এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা, আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেগুং পুরুষং ; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে, আছে নানা বিজ্ঞা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী একাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার ‘কৃষ্টি’র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরের ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাণ শিল্পানি।

ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আর-এক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে ‘রাখালটা বাদর’। খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্ত-সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে, মাধব রাগ করেছে ; যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পক্ষু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমায় বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুহূর্তে না যতই চুনকাম করা থাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের স্রোতে প্রমাণ করে দিতে পারেন, শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই

ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক অহুভূতি সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ুদত্তও বাদর বই-কি। কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এই বাদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবাস্তব কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যকগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্র বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহেতুক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদগুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাকবেথ, হিড়িষা বা শূর্ণনখা, নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্মে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধের। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়; কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক। কোনো-এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে, এর গলাটা না গোকর মতো, না হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদভাগের ঢালু ভঙ্গিটা সাধারণ চতুষ্পদ-সমাজে চলতি নেই, অতএব, ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তটা জীবসৃষ্টিপর্যায়ে সুষ্পষ্ট প্রত্যক। ও বলছে 'আমি আছি'; 'না থাকাই উচিত ছিল' বলটা টিকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখিরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহি নেই।

মাসুখও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা *tease us out of thought as doth eternity*।

ওপারেতে কালো রঙ।

বৃষ্টি পড়ে বস্ময়ম্,

এ পারেতে লক্ষা গাছটি রাঙা টুকটুক করে—

গুণবতী ভাই, আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু, ছন্দের দোল খেয়ে এ ঘেন একটা স্পর্শযোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকার সম্বন্ধে।

ডালিমগাছে পবু ভূ নাচে,
তাকুধুমাধুম বাণ্ডি বাজে।

তনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা স্থম্পষ্ট চলন্ত ত্রিভুজ, ঘেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ; সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে ‘গল্প বলো’; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে; তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যিক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো-একটা রূপ দাঁড় করার মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা ছুর করে; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক’রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
তেঁকিশালে মাসি খান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিরে ভীষণ ছুই গৌফ
বলে, ‘চাই মিসেরিন সোপ!’

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক’রে হাঁ ক’রে শোনে। আমি বলি, ‘আজ এই পর্যন্ত।’ সে অস্থির হয়ে বলে, ‘না, বলো, তারপরে।’ সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, ধারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরই ‘পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা খ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অমুত্তব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠেছে। এ’কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। স্কুল স্কন্দর, প্রজাপতি স্কন্দর, ময়ূর স্কন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সন্দর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান যেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে বা অস্কন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন-কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়তো গভীরতর। ঠুংটির টপ্পা শোনাবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্ভুদ্ধ করে। 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের; একটাতে চরিত্র নেই, লালিত্য আছে, আর-একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্তে অসুশীলনের দরকার করে।

যাকে স্কন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্তে তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। বা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয়, তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু, আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সম্ভানস্নেহে কর্তব্যবিন্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু, রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা স্কন্দ স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টিমত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্তসদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কৃত্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণশ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আন্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সূনিশ্চিত, আমি বিশেষ; অল্প কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্ষায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই, এবং তার অমুভবতা যে-বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগতসময় সম্যক অমুভবতার বাইরে।

পূর্বে অন্তর্ভুক্ত এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান সে-পদার্থ সাধারণশ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে গজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে। চালতা-ফুল এখনও কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামকলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খালি ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হত তা হলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত, সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিন্তা এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অল্প-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যারা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা ধরন এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁখে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তখ্যাটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অমুভবস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রুচনায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় ছিলি।' সে বললে, 'আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।' ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভূত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাস্পোর্ট আছে; সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু, এই যোগিন মিত্র, একে কী বলব। সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য; সেই সাধারণ তখ্যাটা সুন্দরও না, অসুন্দরও না। কিন্তু, সেদিন করণ-রসের ইচ্ছিতে গ্রাম্য মাহুঘটা আমার মনের মাহুঘের সঙ্গে মিলল; প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় যোগিন মিত্র আমার কাছে হল বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অস্বতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদবীথিকার উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে 'মেয়ের বিয়ে' নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু, 'কস্তুর বিবাহ' নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আশ্রয়প্রচারের আশ্রয়ানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে নীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন, তা হলে প্রতিদিনের হাজার-লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক'রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমারসম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাংকোপাঞ্জা ডনকুইক্-সোটের ভূত্যাভ্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে ভর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না— তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ-শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডনকুইক্-সোটের চাকর আজ চিরকালের মাহুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এপর্ষন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিশ্চিভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্থলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য; কিন্তু যুদ্ধে-পন্থু একটি-মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনার জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মাহুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা-ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি, যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে-সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দু্যলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাব্-স্ট্রাকশনের বহুবিভূত নীহারিকার অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য, এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকার ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ-নামক একটিমাত্র বিশেষের তুলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন-নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মাহুষের অন্ত্রে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ-নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মুঢ়তা ও দাগফশ্বল গড়েছে তার স্পষ্টতা

আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে ; কারণ, সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে— সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিজ্ঞানাগরকে । ধর্ম-শব্দের মোহঘবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাণার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্রান্ত করে দিতে পারে । ইন্সুলে ক্লাস-নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে ; সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন-নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ-বিজ্ঞার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন । গবর্মেণ্টের আমলাতন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে ; সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নিচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না ।

মানবচিত্তের এই-সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে । রূপে সেই-সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত । এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম এক্যতত্ত্ব ; এই মানুষের চরম রহস্য । এ তার চিত্তের কেন্দ্র থাকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত— আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে ; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করে ; তার বর্তমানকে অধিকার করে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে । এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে-সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না ; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, বা মৃত্যুহীন । সেই-সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা । এই-সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বাচনীয়তায় ।

সাহিত্যের তাৎপর্য

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি । ওষধি কণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে কণে জন্মায়, কণে মরে । বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখারিত তার বিস্তার ।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর । একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে

হতে তা লুপ্ত হয়ে যায় ; কণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি । আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই । সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না । সে শাল-তমালেরই মতো ; তার কাছ থেকে ক্ষুদ্র ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না । অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সম্বন্ধে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে । এঁকেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য ।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব । ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে থাকতে পারি নে । মুক পশুপাখিরও আছে অপরিণত ভাষা ; তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি ; এই ভাষার তারা পরস্পরের কাছে কিছু ধবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায় । মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে । সন্ধান ও বুদ্ধির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে । হবা-মাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল । যে জগৎটা 'আমি আছি' এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে । বিশ্বজগতে মানুষের যে-যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনার, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি ।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল । তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল ; তাতে সে আশু উদ্বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ । তার আপন ভালোমন্দ-লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে ।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কিনা জানি না । ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিজ্ঞা আমার নেই । কিন্তু, আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না ।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বৃষ্টি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন । মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্তে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে । শাকসব জির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ ।

ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক আতের। সব্জি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়— সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যাবসাদার গোলাপ-জলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহেতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপ-জলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোট চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘ-স্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বৰ্যের সর্বস্বদান পণ করে স্তম্ভ অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শাস্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিকণ জলের উপর সন্ধ্যাত্তের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া স্নান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সন্ন্যাসপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অস্ত পাবের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে কণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বক্সিম ভঙ্গিতে তখনই তুলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই অলম্বনিকার অস্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসিয়ারি চাপা আক্ষেপের স্বরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, ‘ওঃ! মস্ত মাছটা!’ মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্তে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল; চার দিকের অস্ত ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স’রে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহা! তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মাহুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্তে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু, তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সন্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে-মহিমাম্বিত দিনাবসানকে সমস্ত

মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে বলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সন্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মাহুঘের সাহিত্যে। তাই ভূতৃহরি বলেছেন, যে-মাহুঘ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মাহুঘের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করেছে, বিশ্বে প্রসারিত করেছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে-টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আরোজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরব প্রাণীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করেছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য ধার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে ষথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে— তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার করনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহৈতুক চাওয়ার মাহুঘ ঘাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মাহুঘের কত উত্তোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সম্ম-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্রামণ পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উচ্ছত হয়ে, স্বভঙ্গ হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাকে, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারার প্রকৃতি তার অভিবেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাকে, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে; তখন ধীরে ধীরে বন-প্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বদে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক; এমন-কি জানী লোকও মেলে না, সে স্বভঙ্গ; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে

বিশ্বের দোহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতার প্রকাশ পায়। কিন্তু, মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবামুখে অর্থাৎ তার এসোশিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অস্তিত্ব করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে—
নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না; সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়— তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতার আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশস্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা, রসের অস্তিত্ব প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অস্তিত্বের ভাষা করে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না; ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথার্থ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকায় পায়ে ছোট্টো লাল জুতাকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল—

খোকা যাবে নায়ে,

লাল জুতায় পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দিভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অমূল্যতার অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাষের সাহিত্য মাত্রই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু বা বলে, কিছু বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলোট-পালোট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাষের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন 'দেখিবারে আঁধিপাখি ধায়।' দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাহিরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁধিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাহিরে এল, এ ঘটনাটা বাহু ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিছাতের রেখা যেন ঘন প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন এঁকে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গুণ্ড অমূল্য দিচ্ছি, ইংরেজি ভার্জমার থেকে : আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুঝুঝু বইছে শরতের হাওয়া; থবুথবু ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই-যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ার নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে ;

সরোবর চলে গেছে শত মাইল,

কোথাও তার ঢেউ নেই ;

বালি ধু ধু করছে নিঃশব্দ স্তম্ভ ;

শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন ;

নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার ;

গাছগুলো বিশ হাজার বছর
 আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
 হঠাৎ এরা একটি পখিকের মন থেকে
 জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
 একটি নতুন গান বানাবার জন্তে
 চালিয়ে দিল তার লেখনীকে ।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর । সম্ভব হয় কী ক'রে । নদী-
 পর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু মানুষের মানসিক গুণ তো নেই । মানুষের
 আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সাক্ষ্য সৃষ্টি করে । যা বস্তুগত জিনিস তা
মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে । সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে
 মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে ।

✓ বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অসুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের
 সমান নয় । কারণ, বে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র
ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি ; এই
 কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের
 থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর
 হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে
 তুলতে পারে । এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ । যখন মানুষ বলে
 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে, যে-মানুষকে মন
 দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি—
 সেইজন্তে 'হারান্নে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে ।' মন তাকে
 মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে । মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের
 বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয় । মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয়
 তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায় ।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত । নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে
 মানবলোকে হৃদয়বেগের ঢেউখেলা চলেছে । সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে
 তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে । পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ
 প্যাসিভ্ ভাবে ; আমাদের সঙ্গে তাদের যে-ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক
 কিছু নেই, এইজন্তে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে
 সহজেই । কিন্তু, মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে-সম্পর্ক

ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে-অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারি নে। নিত্যঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমার বিচ্ছিন্ন একটা অস্থায় ব্যাপার বলেই তাকে জানি, সে একটা পুলিশ-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে— যুগের সঙ্গে ধিকারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝাঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডবন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে ভেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি ধবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্তক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার করে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে স্পষ্ট করে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ ফলেই ঘটনাগুলি স্মরণীয় হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা ধবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু, এই ঘটনাটি তার পূর্ব-বর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার করে হয়তো রয়েছে— আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই— এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার-চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো করে, মাঝখানে বহু অবাস্তব বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন; সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোনগুলি সার্থক, কোনগুলি নিরর্থক, তা আমরা বাছাই করে নিতে পারি নে। এইজন্মে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র করে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই বা দেখতে পেয়েছে; কার্লাইল তাদের বাছাই করে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকার যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে গেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যাতি অনেক উনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাৱশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে।

কিন্তু, কার্লাইলের রচনার যে স্থনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না ; এইজন্তে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ ।

এই বর্তমানকালেই আমাদের দেশে চার দিকে ধুধু ভাবে রাষ্ট্রিক উত্তোঙ্গের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্লিষ্ট হয়ে উঠছে । কৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আণ্ডবিলীয়মান স্বয়ংস্বনির মধ্যে । ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে, তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি ; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্ষ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে । তখন জঙ্গ ম্যাডিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিশের ঘণ্টা, সমস্ত হবে গৌণ ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটোবড়ো স্বন্দ্ববিবোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানবমনে বিরাটমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে । সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা । তাকে আমরা নৃত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি । সে হল তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ । কিন্তু, এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি । এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল । শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো' ; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে । রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্গভের সঙ্কানে দুঃসাধ্য উত্তর, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, দীর্ঘায় তার বিয়, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্তে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে । এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক । আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত তারা মানুষ ; ব্যাকমা-বেদমি, তারাও তাই । এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনার রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ-রূপে দেখা দেয় ; শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে । মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে ; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না ।

মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে— তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিত্যকাল কাছে আসে। যে-শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য ক'রে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল, রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম ; সে তো একটি মাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্যমানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে ঘেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যেক হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের ধণ্ড ধণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে ; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে একত্রে লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে ; তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্সপীয়ারের রচিত ফল্‌স্টাফ্‌ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্সপীয়ারের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্টাফ্‌ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি ; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত ; তাই তারা একই-জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু, আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিস্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না।

এই সৃষ্টিতে যে-মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হত তা হলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত ; সে বাস্তব যদি হত তবু সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক বলে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে-ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি-সুন্দর, তা সহজ— তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা ; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের স্নিগ্ধ কল্পনা চাই। অর্থাৎ, বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত করে তুলতে হবে মনের জিনিস করে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমতো। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে ; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মকম নৈকট্য দিতে হবে ; সেই নৈকট্য ঘটায় বলেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিষে জন্মেছে, তাকে ছুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালান আগুন নিজের হাতে ; আকাশের আলো যেখানে অগোচর সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে ; প্রকৃতি আপনি যে-ফলমূল-ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে ; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি—সে নিজের সুবিধা ও কৃতি অহুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অঘাচিত পেয়েছিল। কিন্তু, সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি ; তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী করে তুলছে— সেজন্মে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা করে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে

দিকে। মানুষের নগরপল্লী, শস্তক্ষেত্র, উদ্ভান, হাট-ঘাট, বাতাসাতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে; এমনি করে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্ব-জয়ের এই একটা পাল্লা বস্তুজগতে; তাবের জগতে তার আছে আর-একটা পাল্লা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে এক দিকে তার জয়সুভ, আর-এক দিকে শিল্পে সাহিত্যে।

ষে-দিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চার দিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনভিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার— দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি। সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন—পাখির বাসার হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝব্বঝরানি, অঙ্ককারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ভিড়ি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্‌, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক। বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মুহূ গন্ধ ঘেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিশ্বাসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহুপ্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনা-দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ-ফুল অসামান্য; সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু, বা সামান্য, বা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। অজলে-আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি

বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আপন বুদ্ধিতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি ক'রে বিরক্ত করছে— এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে ।

বস্তুত, আর্টিস্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই । যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না । যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে ; বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে । অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে । মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অমুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে । তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত । সেই তার সাহিত্য । ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায় । প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয় ; এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে ।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক । সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে ; সেটা আলোচনার যোগ্য । ক্রৌঞ্চামথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধি বধন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অমুষ্টিভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল ।

কল্পনা করা যাক, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে । এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি । স্বতই প্রসন্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে । তারই উত্তরে জ্যোতিরাজ্বল অগুণরমাগুণ সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত ।

কবিশ্রবির মনে বধন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রসন্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই । তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত । অর্থাৎ, এমন-কিছু যা নিত্যতার আগনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য । যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয় ।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য । এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে, সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে । এই নগরের মূর্ত যেন মানুষের গৌরব

করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, যারা সত্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাক-
সঙ্গেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়— মূনফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ
সারবার কুপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কতৃপন্থের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত
বিকৃতিক্রটি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে ; তাই নির্লক্ষ নির্মমতার কুৎসিত পাটকল
উঠে দাঁড়ায় গজাতীরের পবিত্র শ্রাবলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে
নানাজাতীয় ছরদুশ্চ বসুতিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন
কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদম্বভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তেলকল নোংরা-
দোকান গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার
পাকা করতে থাকে। কিন্তু, রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত
ব্যতায়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা
শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত বাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না,
শহরের সত্য তার কদম্ব বিকৃতিগুলো। কেননা, শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত
নিকটের যোগ; সে যোগ স্থায়ী যোগ, সে-যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় বাতে
তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে,
ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে
যেখানে সেখানে ; কিন্তু, তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্যে সমগ্র
ভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে
মানুষ আপনাই সঙ্গকে, আপনায় সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে।
কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক ; চিরকালের মানুষের মনে
যে-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে অপ্রকাশে কাজ করেছে তা অপ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা
অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো
ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লক্ষ্য পেতে হবে ; কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই
অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার
আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযন্ত্রে জালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো ;
তারই থেকে জলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

শান্তিনিকেতন

পরিশিষ্ট

সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের দ্বারা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট। এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসান্তিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনে গেয়ে। কিন্তু, এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা দ্বারা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।

ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে-তান সেই তান কানে এসে পৌঁচেছিল, তাই নিকটের বাধাসমূহও বাহির হতে হয়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও গঞ্জনা দুই-ই শুনে এসেছি। যে-পথে চলে-ছিলাম তা হার্ট-ঘাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভালো বুঝি নে। রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত। তাই নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হওয়া। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে, যিনি আমাকে এই পদে আহ্বান করেন তিনি আমার সম্মানার্থে, তাঁর নিয়ন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালির আহ্বান যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ নাড়ীর টানে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কী বলেছিল, আজকার অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত-উৎসবের দিনে দক্ষিণসমারপের অভ্যর্থনার বিশ্বপ্রকৃতি পুলকিত

হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিশলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকার সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবে তেমনি একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কত কাল হল একদা একটি প্রাণসমীরণের হিলোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে বয়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের মুদ্রিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হয়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজিসাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজি-শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃতসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ক্রটি করেন নি। কিন্তু, বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সঙ্ঘেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার সেই দৈন্তবিজয়ী ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকার নিমন্ত্রণপত্র আমার স্মৃতিমন্দিরে বহন করে এনেছে।

মাহুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে ষথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্ত-সকলের সত্য সঘর্ষে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সঘর্ষের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের ষথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে, গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূবিবরণের অর্ধগত ষে-বাংলা তার মধ্যে কোনো গভীর ঐক্যকে পাই না, কেননা বাংলাদেশ কেবল মুগ্ধ পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে। তা যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিত্তলোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে, অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙালিকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমনি আর কিছুতে নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মাহুষের ষথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তার পর মাহুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যে সব মাহুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, এবং সেই স্বরাজ্যসীমার শাসন ও পদস্পর্শ সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থকে নিয়মে

বিধৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যত্নকর ভেদ থাকে তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙালিকে নেশন বলা যায় না, কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে সামাজিক ধর্ম-সম্প্রদায়-গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন, বলতে পারে, আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সবকিছুও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলার ভেদের অন্ত মেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুগারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈব-প্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জলহুল-আকাশ-আলোকের সখস্বনুত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে-প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিন্তালোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিন্তালোকে সঙ্গ সখস্বযোগে ব্যক্তিগত চিন্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্তার প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্তার প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরম্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সখস্ব অন্ত্যস্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভিত্তর দিয়ে মানুষের চিন্তালোকে বাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকার দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অন্ত্যস্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে; কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরম্পরের পরিচয়সাধন হতে পেয়েছে এবং অপরকেও তারা আপনায় স্বার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বাতন্ত্র্য; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ কীণ হল তবে সে অন্তের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে

ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মহত্ত্ব পরিষ্কৃত হল।

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশেষ মানুষের যে-প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলাভাষা এক সময়ে গৌরবকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই ধারা সংস্কৃতভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্ত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালি-সাহিত্য ও পন্নায়ের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরগীর বলে বিশ্বাস করে; মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীর ভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিশ্বাস। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ্য পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যে-হেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ—ভাষার দৈন্ত দূর করে আপনার স্বার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বন্ধিমচন্দ্র কোন্ এক উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহু দিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কালো পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দিয়ে সুরূপকরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে-সম্পদ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্তেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, একটি অপরিমিত আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কী যে হবে, কত যে পাব, ভাবীকাল যে কোন্ অভাবনীয়কে বহন করে আনবে, সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই-যে মনে অসুভূতি আগে যে, সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই-যে স্বসম্পন্ননের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনে পাওয়া যায়, এতেই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালির এবং ভারতবাসীর আশা সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে, যতটুকু ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই বড়ো হওয়া যাবে। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ আশা যেদিন ঘুচে গেল সেদিন মনে হল যে, আমার আপনার মধ্যে যে-

শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিগড়বদ্ধ করলে কোনো বড়ো কাজ হয় না। বাঙালি কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে। সেখানেই যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিরাজ করতে পেয়েছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে তার আর হুঃখের অস্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা করে তাতে সঞ্চার করার অধিকার লাভ করে থাকে। বাঙালিজাতি তার আনন্দময় সস্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্বেলতার নিজের আবরণ বিদৌর্ণ করে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত কীর্ণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বস্তার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অল্পত পেয়েছি। ভারতবর্ষের অল্প অনেক জায়গায় ইংরাজি-চর্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজিভাষার স্বজাতীয়ের মধ্যে, পরমাত্মীয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়ে থাকে। এমন দৈনন্দিন্য যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদানপ্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তার ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে যে-মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃদত্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলাদেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারি নে। তবে কিনা এ সম্বন্ধে বাঙালির মনে একটা লক্ষ্যের বোধ জন্মেছে। আজকের দিনে বাঙালির ডাকঘরের রাস্তার বাংলা চিঠিরই ভিড় সব চেয়ে বেশি।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজি লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে, ইংরাজি কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজি রচনা, ইংরাজি বক্তৃতা, অসামান্য গৌরবের বিষয় ছিল।

আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাণ্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ করে থাকেন যে, মাদ্রাজিরা বাঙালিদের চেয়ে ভালো ইংরাজি বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমরা মাথার মুকুট করে পরি।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান্ সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূর-প্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্বস্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে। ঋগু দেশকালের বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।

ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন করে হয়েছিল। শুধু কোনো একজন স্কটল্যান্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয় নি। আসলে যখন চ্যঙ্গার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যসম্পদশালী হয়ে উঠল তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্কটলণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিল। সে-ভাষা আপন ঐশ্বর্যের শক্তিতে স্কটল্যান্ডের বরমান্য অধিকার করে নিয়েছিল। এমনি করেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায় তাদের বাহিরের ভেদ দূর হল। দূরপ্রদেশবাসী বাঙালী যে বাংলা-ভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে যে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করছে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদশালী বাংলাভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েছে। এই অন্তেই, সে যত দূরেই থাক, আপন ভাষার গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হয়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা

নির্বিকার চিন্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি জর্মানির লোলুপতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে টিকল না। কেননা ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা গৃহসজ্জা করতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

মাতৃভাষার আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অল্প ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সঘন্ব স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বৃদ্ধা বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেরই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্টোরের সঙ্গে দাতার যে-সঘন্ব তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সঘন্ব নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ষটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য খুলি আর-এক দিকে দানের অন্ন, তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনও কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অল্প ভাষাকে আয়ত্ত্ব করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অল্প দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসঘন্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেরা-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সঘন্ব সচল।

যুরোপে এক সময়ে লাতিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন যুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকার দিনে যুরোপ নানা বিজ্ঞাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে-মহত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিজ্ঞার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র যুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনও ঘটতে পারত না। আজকার দিনে যুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই কিন্তু তার বিজ্ঞার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জলতার দিক্‌বিদিক্‌ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জালিয়ে এনেছে। যেখানে ষথার্থ মিলন সেইখানেই ষথার্থ শক্তি। আজকের দিনে যুরোপের ষথার্থ শক্তি তার জ্ঞানসমবায়ের।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অল্প একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে ষথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাভাবিক বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে ষথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শূন্যতা। কারণ, সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে যেরে রাশীয় ভাষার অধিকার-ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়ান ফ্রেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে অবশ্যই ধারণা না। বেলজিয়ান ফ্রেমিশ্‌দের অর্নৈক্য সহ্যে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু, সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিফল। আজ যুরোপের বড়ো বড়ো দাগব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কষাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজমের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে-ঘোড়াকয়টি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু, সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াকটাকে

কবে বেঁধে, টেনে-হিঁচড়ে প্রাণপণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে খেমে যায়। এমন বাহু সাম্যকে ধারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্ত্রীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু, পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য। কারণ, বসন্তসমাগমে ফাল্গুনের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড়োরকমের বাঁধনে বেঁধেছেদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হবে—এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই নাকি ঐক্য সাধিত হতে পারে। অষ্টমতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেদে ষ্ঠিতকে বস্তাবন্দী করে যে অষ্টমতের ডান তাকেই মেনে থাকে। কিন্তু ধারা ষথার্থ অষ্টমতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাঁকে বাইরে ধোঁজেন না। বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর-একটা হল পঞ্চায়ৎ।

আজকার এই সাহিত্যসম্মিলনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সম্মিলনে সমাগত হয়ে নিমন্ত্রণের গৌরবলাভে মনের মধ্যে কোনো বাধাবোধ না করে থাকেন তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালির স্বাভাভ্য-অভিমানের অতিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিয় না বাধাই। দক্ষ তো আপন আভিভাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-দেশে হিন্দি ভাষার প্রচলন সে-দেশে প্রবাসী বাঙালি বাংলাভাষার ক্ষেত্র তৈরি করেছে, এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তর-ভারতে কানীতে তাঁরা কী পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কী লাভ করলেন, তা আমাদের জানতে হবে। আমরা দূরে ধারা বাস করি তারা এখানকার এ-সবের সঙ্গে পরিচিত নই; উত্তরভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা গেজেটিয়ারের সহযোগে দেখেছি। বাঙালি যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার করে সৌহার্দের পথ মুক্ত করবেন তাতে কল্যাণ হবে। ভালোবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড়ো করে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয় তখন বাইরের অর্নেক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হয়ে থাকে। আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই

আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তরভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন— এমনভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তরভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন অকুণ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময়ে আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। যা বিধিযাবত্বে।

আজ বসন্তসমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হয়েছে। গাছের বা শুকনো পাতা ছিল তা ঝরে গেল। এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উন্টাত্তে ব্যস্ত আছে তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত-উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে পড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটিকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তার মতই মূল্য থাক, 'এহ বাহু'। এর সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড়ো কথা রয়ে গেছে সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন স্বচ্ছন্দবিকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্যের যে স্বাভাবিক প্রাণগত ক্রিয়া আছে, তা অগোচরে কাজ করে বলে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাঁড়াইখানার জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে ঢের বড়ো বলে মনে করে— এমন কি, তার জন্তে স্বাস্থ্য বিসর্জন করতেও রাজি হয়। সম্মানের জন্তে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা যারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই; প্রাণের সৃষ্টিধরে আছে, দোকানের কারখানাঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণদেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয়; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্তব্য করতে এসেছি; আমি বলতে এসেছি, অহল্যাপাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ হয়েছে— এই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাসাহিত্যে, এইটাই

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো আশার কথা। আজ বাংলা হতে দূরেও বাঙালিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড়ো জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য কথায় ছন্দে গানে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক। আমরা এই শক্তিকে চিরজীবনীয় করি। যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হয়েছে সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্বমানবগভীর আপন আসন ও বরমালা পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার 'চেয়ার' সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস ধুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল তাদের পরিবেষণের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হয়ে সেই ভাবীকালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব। এই অধ্যবসারে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জন করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না। গাছের যে-শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়। অরণ্যের যে-বনস্পতিটি ফুলে ফলে ভরে উঠল যদি তারই উদ্দেশ্যে মধুকরেরা ছুটে আসে তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ করে লয়। আজ বাংলার প্রাক্ষেপেই যদি অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে তবে তাতে কতি কী। তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক।

১৩৩০

সভাপতির শেষ বক্তব্য

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে— যেমন, প্রাণের যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্ত্র অবলম্বন করে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তেমনি প্রত্যেক দেশের

চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের দ্বারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম-মহাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের চিত্তের কেন্দ্রভূমি প্যারিস, ইতালীর রোম, ও প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স। হিন্দু-ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি দূরে দূরে যত বিজ্ঞান উৎস উৎসারিত হয়েছে তার দ্বারা সর্বদাই কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাধাকুমুদবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে কাশী ব্রহ্মবিজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্র ছিল, তার পরে বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি কাশীতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগেও যত কবি, ভক্ত, সাধু, কোনো না কোনো সূত্রে এই নগরীর সঙ্গে তাঁদের জীবন ও কর্মকে মিলিত করেছেন। আজকার দিনে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের যে-উজ্জ্বল বঙ্গভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ও বাংলার নবজীবনের সঞ্চার করেছে, এটি কেবল সংকীর্ণ ভাবে বাংলার জিনিস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ একটি বড়ো উজ্জ্বলের প্রকাশ। সুতরাং স্বতই যদি এর একটা বেগ কাশীতে এসে পৌঁছয়, তবে তাতে ক'রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

নবজাত শিশু জন্মলাভ করে প্রথমে আপন গৃহে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে জাত-সংস্কারের দ্বারা সে সমাজে স্থান পায়। তেমনি ভারতবর্ষের সকল প্রচেষ্টাগুলির যেখানে জন্ম সেখানেই তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, তাদের অন্ত সংস্কারের প্রয়োজন যার দ্বারা সেগুলি সর্বভারতের জিনিস ব'লে নিজের ও অন্তের কাছে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আপন ভূগোলগত সীমায় স্বীয় বিশেষত্বকে আপন সাহিত্যে চিত্রকলায় প্রকাশ করুক, তাকে উজ্জ্বল করতে থাকুক, কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য বাংলার বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ক'রে আপন শাখা বিস্তার যদি করে তবে কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উজ্জ্বলের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে। কারণ, কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভূক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশরই।

এই প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল তার প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি কী। তা হচ্ছে এই যে, বঙ্গসাহিত্যের কল যেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের হস্তে সহজে নিবেদন করে দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে-একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই-সব তীর্থ। পুরী

প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থেই চেয়ে কালীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিদ্বারা সঙ্গমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিজ্ঞার মিলন হয়েছে। বাংলাপ্রদেশ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যোগে কালীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে সে জিনিসটিকে ভারতের ভারতী প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে শুধু বাংলারই শক্তি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; কেননা সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর মধ্য দিয়েই বাংলার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চারণ হয়েছে, তাই বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে বা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা ভারতচিন্তাশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বলে জানতে হবে। এই কথা স্বরণ করবার স্থান হোক সেই বারাণসী যেখানে বাংলার জ্ঞানের অধ্যাপক ড্রবিডের শ্রুতির অধ্যাপকের সঙ্গে একত্র বসে ভারতের একই ডালিতে বিজ্ঞার অর্থকে সম্মিলিত করে সাক্ষিয়ে তুলছেন।

পরিশেষে আমি একটি কাজের কথা বলতে চাই। বাঙালিরা যে এ দেশে বাস করছেন আমরা বাংলা ভাষার মধ্যে তার পরিচয় পাব এই আশা করি। বাঙালি কি সেই পরিচয় দিয়েছে। না, দেয় নি। এটা কি আমাদের চিন্তের অসাড়তার লক্ষণ নয়। যে-চিন্তা ষথার্থ প্রাণবান্ তার ঔৎসুক্য চির-উজ্জ্বল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। বা-কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসবার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে। যে-মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে সেই তো মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে; আত্মার কীর্ণতাবশতই যার সেই মহৎ অধিকার নেই, দরজা পর্বস্ত গিয়ে আর বেশি যে এগোতে পারে না, অহংকারের দ্বারা সেই তো আপনার দৈন্তকেই প্রকাশ করে। মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।

বাঙালির প্রধান রোগ হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যে-জন্ম নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোঁকে ঢোঁকে গেলাতে হয়, তার কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহাকার সৃষ্টি করে তাতে অন্তকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি আপানে বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা আপানে বোতাম-তৈরি সাবান-তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসারে প্রবৃত্ত, কিন্তু আপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম-শিকার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হ'ত। তারা আপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেকেই অপ্রভেদ করছে। যে-সব বাঙালি

উত্তরপশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহাকতার বেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত না করে, তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে তাদের সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে-কয়েদি গারদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে-বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না ভাড়াতে পারলে কান্নীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে। বাঙালির চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মন যে উত্তরপশ্চিম ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারই প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে ফলবান হয়ে দেখা দেবে, তবেই এখানকার বঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ নিতান্ত একটা বাহুল্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এখানকার ভাষা, সাহিত্য, এখানকার স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব তা সমস্তই বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হবে এখানকার বাঙালি-সাহিত্যিক-সংঘ থেকে এই আমরা বিশেষভাবে আশা করি।

এ দেশে যে-সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিঙ্কুক বোঝাই করে মহাযান-বৌদ্ধশাস্ত্র জাপানে চালান করে দিয়েছেন। একত্র সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায় নি তারা হারালো, এই তো সংগত। কিন্তু, এইবেলা সতর্ক হ'তে হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কান্নী। এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষদের সভ্যরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।

আমাদের প্রাচীন কীর্তির যা ভগ্নাবশেষ চারি দিকে ছড়িয়ে আছে আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা তাদের রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি, কত ভালো ভালো মূর্তির টুকরো অনেক জায়গায় পা-খোবার পিঁড়ি বা সিঁড়ির ধাপে পরিণত করা হয়েছে। এই পদাঘাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে। আধুনিক কালে পুরাতন শিল্পের যা কিছু নিদর্শন তার অধিকাংশ পশ্চিমভারতেই বিদ্যমান আছে। বাংলার নরম মাটিতে তার অধিকাংশ তলিয়ে গেছে। কিন্তু, এখানকার পাথরে জায়গায়, কঠিন ভূমিতে, পুরাতন কীর্তি রক্ষিত হয়েছে; তার ভগ্নাবশেষ ছড়া ছড়ি যাচ্ছে। আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে তা সংগ্রহ করুন, এখানে যে 'সারস্বত-ভাণ্ডার' স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনারদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে, আজকের সভায় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পূর্ব পর্বন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করি নি। তাকে আপনার মিনিস বলে বরণ করে নিই নি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি-সব পথে-ঘাটে সামান্ত দরে বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখি নি।

এক সময়ে, মনে আছে, জাপান থেকে কলাগৌন্দর্ঘ্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এ দেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের বর্ধার মূল্য আমাদের অশিক্ষিত দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করবার পক্ষে কলিকাতার আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু, ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাভ্রান্তি যে-অবস্থা সে আজও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। এইজন্তেই আমাদের দেশের উদাসীন মুষ্টি থেকে ভারতের চিত্রসম্পদ অতি সহজে স্থলিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানকার পরিবর্তন এইগুলিকে সংগ্রহ করাকে যদি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন তা হলে ধন্য হবেন।

সকল দেশেই বিজ্ঞার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল-উৎস থেকে নদীর ধারা বহু হয়ে গেলে যেমন তা বহু জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের তপস্বী বা কলার সাধনার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে-সমস্ত কীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অজ্ঞতার চিত্রকলায় যে-ধারা ছিল সে ধারা অনেক দিন বয় নি, তাই ভারতের চিত্রকলা পঙ্কুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে ক্রমে তলার পাঁকে এসে ঠেকেছে। এই ধারাকে বর্ধাসাধ্য উন্মুক্ত করা চাই তো। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের ভালো ভালো সব ছবিই যদি বিদেশে চালান যায়, তা হলে আমাদের দেশে চিত্রকলার বিজ্ঞাকে সজীব ও সচল রাখা কঠিন হবে। আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, এমন কথা বলি নে। কিন্তু, অতীতের সাধনার মধ্যে যে-একটি প্রাণের বেগ আছে সেই বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অতীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে বর্তমান কালের সৃষ্টির উচ্চমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করলে সেই উচ্চমকে সহায়হীন করা হয়। শুধু নিজের অতীত কেন, অন্য দেশের বিজ্ঞা থেকে আমরা যা পাই তার প্রধান দান হচ্ছে এই উচ্চম। এইজন্তে যুরোপে, যেখানে দেশ-বিদেশের সমস্ত মানবসংসার থেকে সকলরকম বিজ্ঞার সমবার ঘটছে, সেখানে সাধনার উচ্চম এমন আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠছে। এই কথাটি মনে করে আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির বর্ধাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি, তাদের পুনরাবৃত্তি করবার জন্তে নয়, নিজের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরুক রাখবার জন্তে।

সাহিত্যসম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্ত বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মাতুষ করিবার জন্ত মাতাকে গুরু মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই বাংলাসাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে, তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কী আছে।

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই' আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানা বিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্ষে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্ম-প্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলাসাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ, ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অল্পবৃদ্ধি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসংগতির সীমা নাই। এইজন্ত তাহার অধিকাংশই আমাদের পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্ত বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই স্বার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মাতুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পহার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড়পুস্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দার চলাফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যই তাহার মন বেপরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে; সেখানে সাহিত্যই অনেক

সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গতি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অস্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিন্তের মধ্যে যে-মাহুষ বন্দী বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক; তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইচ্ছনের নিষ্ফল মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জলিয়া ওঠে; পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে কণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জলে না। বাংলাসাহিত্য বাঙালির মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জলিবে; তখন বড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনই বাংলাদেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মস্ততার তাড়নার বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে ছুঃসাহসিকেরা দারুণ ছুঃখের পথে আত্মহনের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার অন্তান্ত যে-কোনো কারণ থাক, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অস্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নি-সঞ্চয় করিতেছে— তাহার চিন্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে ছুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসারে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, ভোজনপঙ্ক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল স্তব করিয়া পড়িয়া যাইত— মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত— তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তার ও কর্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে, আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা

আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে— সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালি এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অল্প কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাহারা এমনও মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটবে না। শ্রামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অল্প দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অল্প যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিন্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মুঢ়তা। বাংলাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অল্প জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে; যে-অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। এ যেন ভারতের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্ছ চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভূত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের

মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি অবরুদ্ধতার দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালী তাহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কম্বুতি নাই— তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহরৎ করিয়া আমরা হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষার আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান ব্যয়ং তাহার হিন্দুজমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রচেষ্টা কখনও চলে।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানি বাংলা, কেতাবি বাংলা নয়। স্বর্টলণ্ডের চলুতি ভাষাও তো কেতাবি ইংরেজি নয়, স্বর্টলণ্ড কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংকৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু, তা লইয়া তো শিক্ষাব্যবহারে কোনোদিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক-ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়মবন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছ্ৰলতার সাহিত্য খান্খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু, দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্‌ সত্য হইতে পারে। ধানকতক বেজোড় কাঠ লইয়া ষোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে এক্য লাভ করে, এ কথা ঠিক নহে! খুব একটা ঝড় ঝড়ে ঝড় ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোরালে ছাপ্পরে চাকার কোনোরকমের একটা সংগতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীকসাহিত্যে গ্রীক-দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খুঁস্টান ছিলেন। তিনি ষেতভূজা ভারতীর ষে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আবুবি ফারুসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর অগম্যক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোন্ধে কাহারও জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব, সাহিত্যে বাংলাদেশে ষে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাহারা ছেদন করিতে চাছেন তাঁহাদের অন্তর্ধামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ ধনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্ত পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

১৩৩৩

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে^১ কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু^২ এইমাত্র সময়ের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, বমরাজ আর

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ

২ শ্রীমুরেশ্বনাথ দাসগুপ্ত

কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায় নিযুক্ত, সে-কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা করে পড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে ছন্দয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন— সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুধাঁবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু কণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থল যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিরন্তর ধাবমান।

ভয়াদস্তায়িস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্যঃ।

ভয়াদিস্তবাসুশ্চ মৃত্যুধাঁবতি পঞ্চমঃ।

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বই কি। কণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ'; আশু-প্রয়োজনের সঙ্কোপাতী আয়োজনের ষড়নিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

আনন্দরূপমমৃতং ষড়বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তবস্তুর ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু না কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক

জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে তুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার অন্তে আমাকে বাইরে যেতে হবে— যারা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্রমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না— তাদের কানে সুর-শুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়— সন্দেহের মধ্যে তারা খাণ্ডকে পায়, সন্দেহকেই পায় না। সন্দেহ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে-সমগ্রতা আছে সেটি পাবার অন্তে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাজ্ঞন্যায় এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অহুত্ব, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু না কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নয়। এই পরম্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যারা স্বভাবশ্রোতা, যারা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের প্রহ্লা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় প্রহ্লা। সূন্দরকে দেখবার পক্ষে অপ্রহ্লায় মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনার সূন্দরের ধৈর্য অপরিমিত। চিন্তে যখন উপেক্ষা, প্রহ্লা যখন অসাড়, তখনও প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সূন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অপ্রহ্লায় অন্ধকার রাত্রে সূন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঙ্কর তা যুগযুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় কঙ্কণে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দূর থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি 'এসো'। এই পরিষদ আমাকে প্রহ্লায় আসন

দেবার জন্তে প্রস্তুত ; বদেশের আতিথ্য এইখানে অকুপণ ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অস্তুত ঔদাসীন্দের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না ।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন । বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প । আমার লেখার সামান্য এক অংশের তবুজমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তবুজমারও অনেকখানি বথেষ্ট স্বচ্ছ নয় । কিন্তু সাহিত্যে, কলাবচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে কেবলে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হ'তেও পারে । সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে ; লম্বা পাড়ি দিয়ে সঁতার না কাটলেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অস্তরতর । বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্তে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্তে এক গ্রামের মূল্য ছই গ্রামের চেয়ে কম নয় । বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে এককে দেখবার বাধা ঘটার । রসসাহিত্যে এই এককে দেখাই আসল দেখা ।

একজন যুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না । তিনি বললেন, “ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার ; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয় । ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো ; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম ।”

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সম্বন্ধে আমার নানা মত আছে ; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম ; কেউ-বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ-বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাধানা হয়ে ওঠে—নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগত্বের খুলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান । যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব ছর্নভ । যুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চারশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আল্পিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে ;

তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও বর্ধার পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে ধর্মতা তা আমি অনেককাল থেকে অস্বীকার করে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্তত অগদ্বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট করে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধরে দেখতে পারবেন। এ দেশে এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়—জানি যে, কত কৌশল ও কারণে ও পরগড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এই অন্তেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন; আমার মধ্যে যা-কিছু অবাস্তব নিরর্থক কণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে সমস্তই তিনি এক অস্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি স্পষ্ট করবেন। কবিরাজদের পরম স্নেহন যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু, এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সাহসনা নেই। “মাহুঘ মাহুঘের নগদ শ্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্বরগসভার সভাপতির গদগদ ভাষার করুণ রস যেখানে উজ্জ্বলিত, সেখানে তুষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুখারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মাহুঘের কাছে মাহুঘের শ্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস—স্বরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি করে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়। অনেক দিনের কথা বলছি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, ‘রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।’ হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অস্বীকারের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, ‘আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।’

সেই জীবলোকের স্পর্শের অন্তে মনে আকাজকা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই

কথাটি আসছে, 'তুমি আমাকে খুশি করেছে, তুমি যে জন্মেছ-সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।' বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে-প্রীতি, যে-শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে; কণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই; এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিবেশে আমার অন্ত তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাদ্দ দাও নি।

ভাবীকালকে অভ্যস্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সর্গোরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। যেহেতু ফুরোলে যে-গাছ মরে তার অনেক দিন থেকে বরা পাতার সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাড়া হয়ে থাকে পরবর্তী গাছের জন্মে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্মে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবিভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়— তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্ব আর নবীনত্ব প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাণা-বাহাদুর আকাশে যে-অরুণধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রশ্মি যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতার আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলাম—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
তুফা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্যসুখা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্ত ঘটে তখনই মাহুঁষ ভাল হুঁকে নূতনত্বের আন্ধান করে। পুরাতনের পায়ে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা

শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্তে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্তে যাদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্তে যাদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মরুচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

১৩৩৪

সাহিত্যরূপ

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনো প্রকার আঁপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনার প্রবৃত্তি হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে-জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই মরদের জিনিস, সেটা বাংলাসাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শাস্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্পবয়সীদের সঙ্গে একসনে বসে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই স্বযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে ধারা চিন্তা করছেন, রচনা করছেন, বাংলাসাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার ধারা উপযুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কী মনের ভাব নিয়ে আগরে নেবেছেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করবার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন, আমি না কেনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাংলা ভাষার প্রতিদিন যে-সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এই-রকম উপলক্ষ্যে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনানীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব, এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন করে দেওয়া ভালো।

এখানে ধারা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্তী পূর্বকালে। সেইজন্মে এই সাহিত্যসূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্ড। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে,

পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইত্তরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাভীর্ষ দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীর বিষয় যে-রূপের সম্পদ গেল সেইটেতেই সে খল হল। মিল্টন ইংরেজিভাষায় লাতিন-খাত্তমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারা তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাজকা ছিল। যদি বিষয়ের গাভীর্ষই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার গেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষায় স্বভাবকে মেলে চলেন নি। তাই তিনি যে-কল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সস্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাডুঘো বৃন্দসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন; এ ছুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কিনা, সে স্তর্ক এখানে করতে চাই নে— কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপন-সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি রসসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলবকাঙলির যে-চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার রসসাহিত্যের ছিল সুখোশ-পর্যায় রূপ, তিনি

সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সম্ভব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিস, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অমূল্যকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনার তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অমূল্যকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অমূল্যকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের ভ্রমতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা নাহয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মূলধন দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনায়ই। যদি ফেলু করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমবা জানি, এগিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে যোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন-আলোড়নে সমস্ত এগিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল – তাতে আর্টিস্টের মন আগ্রহক হয়েছিল, অভিভূত হয় নি। অর্থাৎ, সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মূলধার হিসাবটাই আত্মও বড়ো হয়ে রয়েছে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে। তার কারণ, বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্য-রূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি খিণ্ডি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ‘বিষবৃক্ষ’ নামের দ্বারাই

মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আত্মবৃত্তিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে—ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপশ্রষ্টা রূপেই বিষয়ক লিখেছিলেন।

নব্যযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক। একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝকঝকে পালিস-করা লেখা; কাটাকাটা ছাঁটাকাটা জোড়া-দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বার্নস্। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্মা-পরা কায়দাকাহ্নের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীট্‌স্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে বলেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয় ভাষা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের বাঁধা মত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধা মতের মাহুঘটি কবি নন; যেখানে সেই-সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টমসন্ একেন্সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তা হলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সন্মোদন করে কীট্‌স্ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের আছ।

যুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে, এমন অহংকার আমি করি নে। শুনতে পাই, দাস্তে, গ্যটে, ভিক্টর হ্যাগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপশ্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার

উপর অত্যন্ত বেশি ঝাঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ানা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে— বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কল্পনার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে মিলেই কি নব্যযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্ত আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। যুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনের বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না—কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিক্সিক্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নতুন কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়— যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাজ করে চলে যেতে পারেন; কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিম্বা আর-একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির

করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁরা একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত— তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এইমাত্র প্রমাণ হত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাগততা প্রমাণ হয়; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়— হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখাটাকে মুছে ফেলে ভলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিতমতো খুবই প্রবল— তার তুচ্ছতাও স্পর্ধিত; সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিকণের হয়তো নয়। কোনো-এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এই জন্মেই অতি অনায়াসেই সে দস্ত করে যে, সেই চরম সত্যের পূর্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী— কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি, আশা করি, আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই-একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনও কখনও নিশ্চয়ই অহংকারও হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে-রূপটা অন্তের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনোই যথার্থ আনন্দ হতে পারে না। বাহোক, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন বাইরের আদর্শের অমুর্ভবন করে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা বলে মনে করতুম।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলাম, একখানা স্নেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জলে উঠল। যে লেখাটা হল সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অমুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেননা আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজেরই মধ্যে,

বাইরেরকার মাপকাঠির সাফ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে-কাব্যরূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো-একটা বিষয় অবলম্বন করে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল বলেই তৃপ্তি বোধ করেছি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অহুত্ব করেছিলুম কোনো-একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতার। সে-লেখাটি মোটের উপর নিভাস্তই কাঁচা; আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারি নে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে বয়সের যে-কোনো বালক কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা রাশীর বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা খাপ খেয়ে গেল এমন কথা বলতে পারি নে। আজ পর্যন্ত জানি নে, কোনো একটা যুগ-যুগান্তরের কোঠার তাকে ফেলা যার কিনা। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভসংকেত বলে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বারবার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, কণিকা, পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেছে। সেই রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। বাস্তবের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যেই মহুত্ত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল; এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু, যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তার উপরে ঝাঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডাক্তারিনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানবসাহিত্যে কখনো-না-কখনো বলা হয়েছে, অগদীশচন্দ্র বৃক্কের মধ্যে প্রাণের যে-রূপটি দেখাচ্ছেন হয়তো মোটামুটি-ভাবে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাস থাকতে পারে— কিন্তু তাকে সায়াল্ বলে না; সায়ালের একটা ঠাঁট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাঁটের মধ্যে কোনো একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যার ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব-হোক না কেন যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র

বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই ষাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উচুদরের মাহুয হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। যুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে শুরু নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাতে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনারূপে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কালচারের লক্ষণ বলে মানি। চলতি শ্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এই জন্তে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে আবসাদ ক্রান্তি রোগ মুছাঁ আক্ষেপ দেখা দেয়— তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু, দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে যুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার সীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকর্ষার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দামে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রলেমের বেঞ্জিমেণ্ট তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রলেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্য-কলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবাস্তব। যুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রলেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে; তাই প্রতিদিনই দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু, এটা একটা কণকালীন অবস্থা— আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজের দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে

দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হলে পর অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ বললেন : কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)। কবি টম্‌সন্ ঋতুবর্ণনাঙ্কলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অহুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্যবিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্‌সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই, ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সেটি আছে।

আমি বললুম : তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। স্তম্ভর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে, সেই রূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাঁট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্পদে তা সারবান, ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরকমের ষষ্ঠগুলি গুণ তার বেশি তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই-সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ করে কীট্‌স্ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানবজীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই— তা ছাড়া, কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয়— কিন্তু এই নৈরাশ্রবেদনাকে উপন্যাসমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে ওর কাব্য-হিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলছেন—

Here, where men sit and hear each other groan ;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs ;
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs ;
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.

একে ইন্টেলিটি বলা চলে না, এ রূপ চিত্তের অভ্যুত্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে— তৎসঙ্গেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা।

যে ভাবটিকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোখুলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন—

যব গোখুলিসময় বেলি
ধনী মন্দিরবাহির ভেলি,

নবজলধরে বিজুরিবেহা বন্দ পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। আর-একজন কবি দারিদ্র্যহুঃখ বর্ণনা করছেন। বিষয়-হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অল্পের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়— তাও যে পাশে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়— দরিদ্র-নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন—

হুঃখ করো অবধান,
হুঃখ করো অবধান,

আমানি খাবার গর্ত দেখো বিস্তমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারা তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাব ভাষা ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটাই লক্ষ্য করবার যোগ্য। ‘তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে’— দারিদ্র্যহুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটি অপৰ্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার ক্ষমতা বঙ্কিম তার মুখে বড় দর্শনের আন্ত আন্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাবার ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইচ্ছাশাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি গন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যয় কোনো

একটি চারিত্ররূপ আঁকত করা হল কিনা। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রসঙ্গটি হচ্ছে এই যে : হে গুণী, কোন্ অপূর্ণ রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।

১৩৩৫

সাহিত্যসমালোচনা

আমার দুটি কথা বলবার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।^১ সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি। অনেক দিন এ সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করেছি, কখনো কোনো রিপোর্ট ঠিকমতো পাই নি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো-কিছু সম্বন্ধে যখন যে-কেউ রিপোর্ট নিতে ইচ্ছা করেন তাঁর নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত করে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট বেরোয় আমাকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযতভাবে চিন্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে, কেননা এ সম্বন্ধে এখনও উত্তেজনা আছে—সেজন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে অশ্রায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। এরকম ভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না হোক, আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কী মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মতো বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝি নি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতাম। অন্তের মত-অভুযায়ী লিখতে পারলে, অন্তকে অভূকরণ করতে পারলে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি—সে যে কত বড়ো অসত্য, বারবার, হাজার বার তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

আমি সেদিন যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি

^১ বাংলার কথা। ৬ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৫

ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যা বক্তব্য সে আমার লেখার বারবার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যারা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো কতি করে থাকে, সমাজরক্ষার ব্রত যারা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন; আমি সে-দিক থেকে কখনো আলোচনা করি নি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরস্থান মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈনন্দ প্রচার, মানুষের লক্ষ্য ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা গৌরব দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাস্তবিক যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন; এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অমূল্য প্রকাশ করবার জন্তে, এমন কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। কলাবান বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে আপন অলংকারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড়ো ছবি আঁকেছেন এবং তাতে মানুষকে বড়ো দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েছে। আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে-সব আকাজক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না বলে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যারা রচনা করেন ও যারা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে স্বেযোগ গ্রহণ করে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্তে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার স্বেযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে

কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাতকালে প্রকাণ্ড একটা বীরস্বপ্ন প্রাণসম্পদপূর্ণ মহুঘৃষের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেকসময় সমাজের পাথের নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে, এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেহপ্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাহত করে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে-মুহুর্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্বল হয়, তখনই সেগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোনো-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না, তাকে একান্তভাবে অস্বভব করি বলেই। সেই অস্বভাবের জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে শুরু করি। এইজন্য এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতি-গুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজিসাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হয়েই নির্লজ্জ হয়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তার পর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্মকে মোহমুক্ত করে পূর্ণতা দান করবার জন্তে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এ দিকে বিশেষ কোনো যুগে যে-সব লালসার কাব্যকীর্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে; মনে হয়তো হয়েছিল, এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে, এ জিনিসটা সেই যুগের কণকালীন উপসর্গ।

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃত-সাহিত্যে সাধনার দৈন্ত এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জী প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীরবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথঘাতার পাথের হচ্ছে উৎকর্ষের জন্তে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই

মনে তার জন্তে যে-আকাজকা আছে তাকে রক্তের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কোটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসারযাত্রায় ব্যস্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাজকা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাজকার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়, ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাকে, তার বিনাশ নেই। যুরোপীয় জাতির ভিতর যে-অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তৎসঙ্গেও মানুষ বাঁচে। দুর্বল শরীরে তার প্রকাশ হলে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিন্তকে ও শক্তিকে জাগরুক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্কার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা ধ্বংস করব না। এ জন্তে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্ষ পাব। যে-আত্মসংঘর্ষের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ক্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনও পাকবার সময় হয় নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন আগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।

যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষগ্ণতার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্রেটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্ত, দেশের জন্ত, সমাজের জন্ত যাঁরা কাজ করেন,

ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংঘের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনও না বলেন, উন্নততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একে-বারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে যে-সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন ‘আমরা জিতেছি’, কখনও হারকে স্বীকার করতে চান নি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হতে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি, জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অটুহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব-চাইতে বেশি আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হয়ে বলতে হয়, পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে তো দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে-শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হলে তার চেয়ে এমনতরো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনও কলুষ লাগে নি, এ কথা বলতে পারব না। যদি বলি, যা কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অভাবহীন দাস্তিকতা আর-কিছু হতে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দ্বারা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন, এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মাহুঘের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য, সেই সম্বন্ধে কারও কিছু বিশেষ ভাবে বলবার থাকে সেইটাই বলবেন, এই সংকল্প করেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনও মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন,

এ মত সেকলে, পুরোনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্ধ বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে-মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব। আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উর্দা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই, সেটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

স্বনীতি চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ : সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্তবর্তী ব্যবস্থা স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক— ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়— তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পালা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অস্বভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে-কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিক্রম করে তার বিরুদ্ধবাক্য বলে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আবু অন্ন নয়। নীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষ্যে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজ-ব্যবস্থার অন্য বাধাবাধি যে-নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্টা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত

সত্য, যেমন লোককে প্রভাষণ করবে না, ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় : কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভৃত্ত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি।

রবীন্দ্রনাথ : এ কথা পূর্বে বলেছি। মানুষ যেখানে অস্বী করেছে সেখানে সে যা পেয়েছে তার বেশি দিয়েছে। ঐশ্বর্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়ি। সেই ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। জীপুরুষের সম্বন্ধে মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্ভূত কিছু থাকে না। উদ্ভূতটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ-ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ করতে পারে। বর্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি। অনেক সময় অতি সভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য বধন আসে তখন বাহির হতে বর্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত বধন মান হয়ে আসে, চিরকালের জিনিস সে বধন কিছু দিতে পারে না, তখন তার হুর্গতি। গ্রীস বধন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেই সঙ্গে থাকলেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাক বড়ো হলেই বিপদ।

একজন প্রশ্ন করলেন : আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এরকম কোনো আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনার লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ : এটা সাহিত্যিক নীতি-বির্গহিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা—এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না—অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। স্রবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত

সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্টিজ শাসনশক্তির প্রেস্টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্নমেন্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্তে যাবের মাত্রাটা ছাড়িয়ে মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি, স্থবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস : এখানে যে-আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবতঃ 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই ?

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই কথা হচ্ছে।

ইহার পর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'র আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine, তাঁহারা বাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদর্শে সাহিত্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনার শ্রীনিরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ্র, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,, শ্রীঅমলচন্দ্র হোস, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের উত্তরে বাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।

মণিমুক্তা সম্বন্ধে

যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে

যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্বতা নয়। তা কণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোগমর বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালবাসা মানি নে, স্তবরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীণ্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না,

অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।

‘শনিবারের চিঠি’র সমালোচনা সম্বন্ধে

‘শনিবারের চিঠি’ যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশ্বস্তভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্তভাবে দোষ নির্ণয় করার দিকে সমস্ত চিন্তা নিবিষ্ট করি তা হলে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। ‘শনিবারের চিঠি’তে এমন সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যারা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট করে যে সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য করে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয়, কঠিন কথা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য বেই হোক আর যাই হোক।

কর্তব্যপালনের যে অবশ্যস্বাভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। ‘শনিবারের চিঠি’র লেখকদের স্মৃতিস্ম লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্ধের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্ণে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে— কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অঙ্গচিকিৎসায় অঙ্গচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই ‘শনিবারের চিঠি’র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অঙ্গচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়। প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে ‘শনিবারের চিঠি’ যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি। কর্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পছতি সম্বন্ধে বিশেষ সূচি রক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায়

কেবলমাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরও অনেক কিছু না মানতে পার। যেমন, হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা হলে বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্ভর্তী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে বলে ভীষ্মনাগের সন্দেশ ভালো, আমি বলি ভালো নয়, তার দ্বারা সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্বতার প্রমাণ হয় না।

সর্বশেষে

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার, দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, এ কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল, তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দরিদ্রের অনুভূতি, আমি বলব সেটা গৌণ। তোমরা যদি সর্বদা বাস্পরুদ্ধ কর্তে 'দরিদ্রনারায়ণ' 'দরিদ্রনারায়ণ' কর তাতে ক'রে এমন একটা বায়ুরুদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্তে কঁাদব। এরকম ভঙ্গিমা বিস্তারের প্রশ্রম সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্ত গল্প পড়ি না। গল্পের জন্ত গল্প পড়ি। 'গরিবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভদ্রী মাত্রেয়ই অনুবিধা এই যে, অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়—অনুবৃদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি বা মাহুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরিবিয়ানা' বা 'যুগ' প্রচার করবার জন্ত নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্বদে কোনো দলের ছাপের উল্কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।

পঞ্চাশোধর্ম

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার অন্ত মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেছেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ষড়্ধিধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তরপরিণতি জীবনের ধর্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবনযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের কসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন করে দিলেই হল না। শাস্ত্র বলে, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'; বা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান— সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্মল জলের দান্ধিণ্য, সেই পুণ্ডার স্নেহেই জলদানের পুণ্য; দৈন্ত যখন এসে তাকে ভলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ষোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বলতে পারি যে, থাক, আর কাজ নেই।

বর্তমান কালে আমরা বড়োবোশ লোকচক্রর গোচরে। আর পঞ্চাশবছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না-করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করত, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে 'বনং ব্রজেৎ' বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল; আজ সেটা আগাগোড়া নিমূল। আজ মন যখন বলে 'আর কাজ নেই', বহু দৃষ্টির অহুশাসন দরজা আগলে বলে 'কাজ আছে বই কি'— পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে; পাশ কাটিয়ে চুপি-চুপি সরে পড়বার জো নেই। ষরজোড়া বহু চক্রর ভৎসনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারি দিক থেকে রব ওঠে, 'বাও কোথায় এরই মধ্যে?' ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

যে কাজটা নিজের অন্তরের করমাশে তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোনো দায় নেই। কিন্তু, ছর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবি দুর্বল। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য করেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁজে হোক, অহুরাগের ব্যথায় হোক, ষোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে যখন-তখন যাকে-তাকে বলে উঠতে পারে, 'তোমার রসের জোগান কমে আসছে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ

ফিকে হয়ে এল।' তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ শেষ যুক্তিটা এই যে, 'আমার পছন্দ-মারফিক হচ্ছে না।' 'তোমার পছন্দের বিকার হতে পারে, তোমার স্ক্রুটির অভাব থাকতে পারে' এ কথা বলে লাভ নেই। কেননা, এ হল ক্রটির বিরুদ্ধে ক্রটির তর্ক; এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শাস্তির কটু কমাবার জন্তে সবিনয় দীনতা স্বীকার করে বলা ভালো যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতাকালে যে-উপহার দেওয়া গেছে তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য অভাবের সময়কার ক্রটি কমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্রান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে ছুঁষো দেয়। আপন নবশ্যামল ধানের খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না আঘাতে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্যসমারোহের কথা।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবি প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্বকৃত কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গুরীতি আছে। পেনশনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু, সাহিত্যেই পূর্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই কমা করতে চায় না। এই তাঁর প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ক্রটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব করবার জন্তে তাদের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে এমন মানুষ আছে যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃপতা অনুমান করলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নিচে ভূমিসাৎ করবার ছতো খুঁজে বেড়ানো, কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতর সংকটসংকুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সংগত; কেননা, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা-উদ্‌বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোনো মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য বলে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্তে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্তে আরও পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মাহুষ কর্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হয়েছে, কর্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্তে মাহুষকে কাজ করতে হবে, নিজের জন্তে মাহুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্মের চলতি শ্রোত আপন বালির বাধ আপনি বাধে, আর সেই বন্ধনের অহংকারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার উর্ধ্বে আর গতি নেই। এমনি করে ধর্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা করে আপন সীমা নিয়েই গর্বিত হয়, তেমনি সকল প্রকার কর্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গড়ে তুলে সেই সীমার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা করতে ভালোবাসে।

সংসারে যতকিছু বিরোধ এই সীমার সীমার বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা বিষে ও চিন্তাবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম হতে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর-একটা ভাগ আছে যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাতে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এমন দিন আসে যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো; নইলে বাইরে ওড়ে ধুলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কহুয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যালোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেককাল দেখি নি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এইজন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরকথা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়মহলে যে-কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লজ্জন করব বা করতে পারব, এমন কথা মনেও করি নি। তখন এমন কিছু লিখি নি যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তিহীনতার অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুনতে হয় নি যাতে সংকোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গড়ে পড়ে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছেলুম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ক্রটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই

এই সীমাটি ছই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে-পরিভূক্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিন্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারই আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্বাবরতাই স্ববিরত্ব প্রমাণ করে; তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকে সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে—সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সঙ্কটগণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন করে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে ধরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অমুর্ভুতি করে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন করে চলে, পথনির্মাণের জন্ত তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সংকুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে দক্ষিণ-হাওয়া চলতে শুরু করে। কিন্তু, বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে-অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোজে তার মন সংকীর্ণ, তার স্বভাব রুঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারি আসর জমেছিল, নব্বীপের কীর্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই

ব'লে দরবারি তোড়িকে গ্রাম্যভাষার গাল পাড়তে বলা বর্বরতা। নূতন কাগকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারি তোড়ির নিত্য আসন আপন মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাজিল্য ক'রে যদি খাটো করতে চায় তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের অন্ত নূতন অর্থ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু, নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয়তো কোনো আশু উদ্ভেজনা, বাইরের কোনো আকস্মিক মোহ, তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয়তো হঠাৎ একটা আগাহার দুর্দমতা তার কসলের খেতের প্রবল প্রতিবাদ করে; হয়তো একটা মূদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয়তো বাহাবা বলে, কিন্তু সর্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের ষথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, ধারা কালের অন্ত সত্য অর্থ্য এনে দেন তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে, যুরোপের চিন্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ার তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া-যুগ জুড়ে সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চলেছিল যে মনে হয়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্তিত হয়ে প্রাণস্বর উত্তমকে যেন নিরস্ত করে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলানৃষ্টিতে, একটা অর্ধেধের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিন্তা সবকিছু উলট-পালট করার অন্ত কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ার একটা রব উঠল 'আর ভালো লাগছে না'। যা-করে হোক আর-কিছু-একটা ঘট চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব মন্থর বিধান মানতে চায় নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্নত চরগুলো একটি একটি করে তার অঙ্গনে ক্রমে ক্রমে কুঁটে লাগল; ভাবখানা এই যে, উৎপাত করে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতার ঐখর্ষের অধিপাত

নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চলছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাধা, এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিঁদুকগুলোকে কোনো-কিছুতে নড়চড় করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এইজন্য একেবারে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য চাকল্যকে সে-দিনের মানুষ ঐ লোহার সিঁদুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল। একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিঁদুকে সিঁদুকে ভয়ংকর মাথা-ঠোকাঠুকি; বহুদিনের স্বয়ংক্রিয় শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধুলোয় ধুলোয় ছড়াছড়ি; সম্পদের অয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔৎসাহ্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সহিতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাগ্র। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্ষাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহড়ো বেধে গেল, গোলমাল চলছে— সাবেক কালের কর্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো-কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলাগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে 'ভালো মানুষের মতো ধামো,' কেউ বলে 'মরীয়া হয়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে ধারা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ করছেন তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হয়ে বসে ছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটাঁকষল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো সে তর্ক তুলে ফল নেই; আপাতত এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্তন করতে বসল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্ছে না ব'লে ধারা উদ্বেগ প্রকাশ করছে তারাও ঐ পঞ্চাশোর্ধ্বের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেন, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্ধ্ব আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম করে থাকি তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মণ্ডিত হয়ে উঠবে। নবাগত ধারা তাঁরা যে-পর্বন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্বন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুবলিষ্ঠ

হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অদ্বুতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতকণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটানি করতে থাকবেন, ততকণ সেই অতিমাত্র উদ্বেজনার ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অল্পপলক, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই অল্প কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারে নি, সাহিত্যে কলারচনার তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মাঝে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ করে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যারা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিষ্কৃত মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যঙ্গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষে-আদর্শ কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়েপুরুষের মনকে এক কাল থেকে অল্প কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় কচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলার আমাদের সেই ভালো-লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভঙ্গসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাগ সেই যুগেই। সেই যুগকে তার

সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্বন্ত আমার কাজ ছিল। যুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষাকারে তাকে নিশ্চিত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার ধারা অগ্রভূত তাঁদের ঘোষণাবাগীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের স্ননির্মল শান্তি আনুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্চাতুর্ঘের দ্বারা নয়। রাজির চক্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে তখন কুয়াশার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নবপ্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্ধান ঘটে।

পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লাস্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সমংকোচে 'তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের ধারা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন—কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সাস্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোদ্বর্ষে নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে দ্বাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি— যদ্ ভদ্রং তন্ন আনুব : বাহা ভদ্র তাহাই আমাদের প্রেরণ করো।

১৩৩৬

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বঙ্গ বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্রামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উচ্চতর রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষ্যে বর্তমান যুগের বেগমান চিন্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান

যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বন্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনার জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমাহুষ এবং তার অহুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অল্প দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অস্বীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উজ্জ্বলীক বিকাশধর্ম নিরন্তর উন্মুখ, কোনো ছন্দমা কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বন্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্তে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম সূত্র যতকিছু রহস্যকে অব্যাহিত করেছে। তার অস্বহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদানসংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ, অত্যাঙ্কিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার-জ্ঞান-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীলনদীর তট থেকেই আনন্দ আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অস্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি—মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে সেই অহংকারের নিফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্বৃত্ত যাকিছু গ্রহণীয় তাকে সন্মুখে আসবামাত্র চিন্তে পারে ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে প্রদীপিত করতেই হবে। চিত্তদম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মাহুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা

ধার-করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিম্নত উচ্চত হয়ে রইল। ইংরেজিসাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্যরচনায় ইংরেজিভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীণ্যের লক্ষণ। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও বাংলা-পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্ক্তের। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়ার্গেয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিশ্বয়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অস্তরে অস্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন; তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেবি করলে না। পূর্বকালের থেকে তার বর্তমান অবস্থার যে-প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্ব-পরিচয় এমন-কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুর্ভাগ্য তার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গম্ভ সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সঞ্চারিত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গম্ভেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গড়ে, পড়ে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্টন-রচিত মহাকাব্যসংকারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেরই শুরু থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘগুচ্ছ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেরই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার অন্তে

আপন ভাষাকেই বন্ধে টেনে নিলেন। যে-যন্ত্র ছিল কীর্ণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর স্বরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাকর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্ত্রিত রথে চড়ে বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবহুর্ত-ধ্বনি'— কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে-নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।

আমি জানি, এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতনকালের অমুগ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ শ্রাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তাঁরা যে স্বয়ং স্বার্থতঃ সেই সাহিত্যেরই রসসম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূনির্মাণের কোনো এক আদিপর্বে হিমালয়পর্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাগু নয়; অন্তরে বাহিরে চার দিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর; সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তা হলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবেই, শ্রাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে শ্রাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি পেয়েছিল, তাতে তার চিন্তাশক্তির অসামান্ততাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ের-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে ছরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বামুর্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্ত্রিত করে তোলাবার জন্যে সংস্কৃতভাষার

থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পদ্যের সনাতন সম্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাকরের যে-বল্লা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে— প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে-যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজিসাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহ্বল। সেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়্রন, মেকলে, বার্ক্‌ তাঁরা প্রবল উত্তেজনার আর্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলাসাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উত্তম সত্ত্ব জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা কারও ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙে নি। আকাশে অরণালোকের স্বাক্ষরে তখনও ঘোষিত হয়নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বন্ধিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিধানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অস্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, যুগালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। ধারা তার রস পেয়েছেন তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। এ কথা মানতেই হবে, বন্ধিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত ভাবে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজিভাষায় বিদ্বান বলে যাদের অভিমান তাঁরা তখনও তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি; অথচ সে-লেখা ইংরেজি শিক্ষা-হীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনানীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাত্যাসের অপ্রশস্ত বেইনকে অতিক্রম করতে পারলে— যেন অনূর্ধ্বস্পন্দরূপা অস্তঃপুরচারিণী আপন

প্রাচীর-ঘেরা প্রাক্‌গের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অহুকুল না হতে পারে কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অহুকুল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিন্তে নব্য বাংলাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অব্যাহত হল সর্বত্র। ইংরেজি-ভাষায় যারা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নব্যসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমাটিক হয়ে উঠছে, এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গরসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমাটিকের লীলা। রোমাটিকে মুক্ত ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে করে পূর্ববর্তী বাধা নিয়মানুবর্তনের তুলনায় বিপজ্জনক এমন-কি হান্তজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পারে শিকল বাধা না থাকতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্তু, বড়ো পরিপ্রেক্ষিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকল-প্রকার স্থলনকে অতিক্রমিতিকৈ সংশোধন করে চলে।

বাই হোক, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ্য নেই। এই সভাতেই বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, সভার কার্যরশ্মির পূর্বে সূত্রধাররূপে আজ তারই কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলাপ্রদেশের বাইরে বাঙালি-পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলাভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অস্তরের নাড়ীর যোগ—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাঙালিচিন্তের যে-বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালিজাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে-জমি আছে তার মাটিতে যদি বাধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অস্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্র রক্ষা পায়। বাংলাদেশের চিন্তাক্ষেত্রকে তেমনি

করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলাসাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরও পকাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অঞ্চল আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্য। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনার বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি ষত দূরে যেখানেই থাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাঙালির ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্ধাপূর্বক অবাঙালিদের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে— কেননা বাংলাভাষায় যে-সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লঙ্কার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বহুতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করার আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু, মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অগ্র প্রদেশ বাঙালির পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অগ্র প্রদেশের বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাসংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অগ্রপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলাভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অগ্র প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অগ্র দিকে। অথচ সে-সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অগ্র প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয় আমরা তার অতি স্নানর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তরপশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক-গামী ভটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ-প্রদেশের বাঙালির হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালি আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, যেখানে থাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মাহুত্বভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অহুষ্ঠানে দল বাধা আবশ্যিক হয়। কিন্তু, সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দেশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুলল। এই বহু স্রষ্টার নিভৃত-তপো-জাত সাহিত্যলোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলা-সাহিত্য যদি দল-বাধা মানুষের সৃষ্টি হত তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরম্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ— আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই 'আনন্দাঙ্কোব'। মানুষের সব-চেয়ে নিকটতম যে-স্বজনবন্ধন বিবাহব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরষাত্মিক মনোবৃত্তিই তো বাংলা দেশের সনাতন বিশেষত্ব। তার পরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরম্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শক্রতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নির্ভর পীড়ননৈপুণ্য সর্বদাই উদ্ভূত। সেটা আমাদের ক্রুর অট্টহাস্তাদ্বেল গ্রাম্য

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অসৌজন্যসম্মোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তুণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে ছুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না— কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্মে সকল প্রকার আঘাত এড়িয়ে ও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে বলেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্মে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্যে অনুভব করছে। মহৎসাহিত্যপ্রবাহিনীতে বাঙালিচিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্ছে বলে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নাই। কারণ, সর্বত্রই ভদ্রসাহিত্য স্বভাবতই সকল দেশের সকল কালের, যা-কিছু স্থান্নিত্বধর্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর-সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা মানি-জনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গন্ধার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর; কিন্তু শ্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাই নে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ মহানদী তো মহানর্দমা নয়। বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাস্ত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্ব-দেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সন্মিলনী-আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীয় জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আত্মক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলাদেশের হৃদয়ে বহন করে আত্মক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাজক্ষা, অস্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপিতে, সাময়িক পত্রে, এবং প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালে, এক রূপ পাঠ দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধে, সেরূপ পাঠভেদ-সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য এখানে সংকলিত হইল। কোনো কোনো রচনার প্রসঙ্গ ধরিয়া কবির যে-সব প্রণিবেশ উক্তি পাওয়া যায় তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকতর পূর্ণাঙ্গ তথ্যসংকলন রচনাবলীর সর্বশেষ খণ্ডে পত্নী স্বাকারে মুদ্রিত হইবে।]

প্রহাসিনী

'প্রহাসিনী' ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'খাপছাড়া' অংশ বাদ দেওয়া হইল। উক্ত কবিতা তিনটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একবিংশ খণ্ডে 'খাপছাড়া' গ্রন্থের সংযোজনাংশে (৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশস্থলী প্রদত্ত হইল—

আধুনিকা	প্রবাসী	১৩৪১ চৈত্র
নারীপ্রগতি	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ
রত্ন	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪২ কা্তিক
পরিণয়মঙ্গল	বিচিত্রা	১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
ভাইদ্বিতীয়া	প্রবাসী	১৩৪৩ পৌষ
ভোজনবীর	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
গরঠিকানি	প্রবাসী	১৩৪৫ আশ্বিন
অনাদৃত লেখনী	বিচিত্রা	১৩৪৪ বৈশাখ
পলাতকা	বিচিত্রা	১৩৪১ চৈত্র
গৌড়ী রীতি	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ

১৩৪১ সালের মাঘের 'বিচিত্রা'র 'নারীপ্রগতি' কবিতাটি বাহির হইলে 'অপরাজিতা দেবী' রবীন্দ্রনাথকে অক্ষররূপে ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। 'আধুনিকা'

কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাধিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর ১৩৪১ সালে চৈত্রের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৮২২-৩৪) একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

'রঙ্গ' কবিতাটি যে পুরাতন ছড়ার অল্পকরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথ তাহা 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ছড়াটি নিয়ে আগাগোড়া মুদ্রিত হইল—

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো কিঙের বেশ ।
তাহার অধিক কালো, কল্লে, তোমার মাথার কেশ ।

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস ।
তাহার অধিক ধলো, কল্লে, তোমার হাতের শব্দ ।

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুমুমফুল ।
তাহার অধিক রাঙা, কল্লে, তোমার মাথার সিঁদুর ।

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্ন, এ তো রঙ্গ ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
নিম তিতো, নিম্বন্দে তিতো, তিতো মাকাল কল ।
তাহার অধিক তিতো, কল্লে, বোন-সতিনের ঘর ।

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
হিম জল, হিম হুল, হিম শীতলপাটি ।
তাহার অধিক হিম, কল্লে, তোমার বুকের ছাতি ।

উদ্ধৃত ছড়াটি সম্বন্ধে কৌতুকজনক বিস্তৃত আলোচনাও উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃ ৫২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

'পরিণয়মঙ্গল' কবিতাটি স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ ('জয়া-মটর-শুভসম্মিলন') উপলক্ষ্যে রচিত হয়।

বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিক্রমে কয়েকবার ভ্রাতৃ-
দ্বিতীয়ায় ফোটা ও শ্রদ্ধার্থ্য পাঠাইয়াছিলেন।^১ 'ভাইদ্বিতীয়' কবিতাটি ১৩৪৩ সালের
(ইং ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আশীর্বাদস্বরূপ শ্রীমতী পারুল দেবীকে প্রেরিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে তাহাকে
যে পত্র লেখেন তাহার কয়েকটি পঙ্ক্তি আলোচ্য কবিতা-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-ভ্রাতার স্ববগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে
দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্য হয়ে রইল, এটা
তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান-
স্বরূপে বড়ি দান করুন, এই আমার প্রত্যাশা।

—দেশ, ২ মাঘ ১৩৪২, পৃ ৩৬১

শ্রীমতী রাধারানী দেবীর দোতয়ে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র ১৬ জুন ১৯৩৮
তারিখের একটি কবিতায়-লেখা নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা
জানাইয়াছিলেন—

রবিয়াগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—

ভাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানি' কবিতাটি উক্ত পত্রের
জবাবে লিখিয়া নিম্নোদ্ধৃত 'পত্রদূতী' কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ উহা শ্রীমতী
রাধারানী দেবীকে পাঠান। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৭৬০-৬৫)
অপরাজিতা দেবীর 'নাংনির পত্র' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গর-ঠিকানী' একত্র
প্রকাশিত হয়।—

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারানী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,

ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।

যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,

তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমায়ে দিলেম কষ্ট।

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ('রবীন্দ্রনাথের চিঠি', দেশ : ২৪ পৌষ, ২ মাঘ ও
৯ মাঘ ১৩৪২) উল্লেখ্য।

আজি আবাচের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
 বাদলা-হাওয়ার কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষি ।
 ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
 খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষণ ।
 তাহাদের চিঠি আনমনাদের আসে জানালার পার্শ্বে,
 যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে— চিঠিখানি সবাকার সে ।
 উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারি ছন্দে,
 শুধন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে মিস্ত্র মাটির গন্ধে ।
 অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্ত,
 সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা, কিন্তু তারা যে অন্ত ।
 জানা-অজানার মাঝখানটাতে নাৎনি করেছে সন্ধি,
 কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাফিসের বন্দী ।
 মর্তের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌতো,
 তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে ?
 জানি এ স্বপ্নোগে চাও কিছু কিছু হাল খবরের অংশ,
 হয় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায় হয়ে এল ধ্বংস ।
 সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন,
 আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য ।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ

৫ আবাচ ১৩৪৫

পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বর্জিত ছত্র পাওয়া যায়—

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'হিস্টিরিয়ার পাণ্ডুরা' ছত্রটির পর

ভলোয়ার থাকে সংক্ষেপে তার ধাপে,

গদার গুরুতা শুধু তার মোটা মাপে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'হালিয়ে যে ওর দাম' ছত্রটির পর

'রবি' নাম যদি বলি নাম নহে ওটা,

ললাটের 'পরে জরতিলকের ফোটা,

তা হলে শোনাবে অহংকার সে কত,

'অপরাজিতা'ও নহে কি তাহারি মতো ।

ঝগড়া বাধিয়ে এইখানে লিখি ইতি,
সন্দেহ করি, ভালো নহে এই রীতি—
শাস্তিভঙ্গ করে দেবে এই ভাষা,
পুরো শাস্তির চেয়ে তারি 'পরে আশা।

'অনাদৃত লেখনী' কবিতার পঞ্চম হইতে দশম ছত্র পর্যন্ত অংশ ১৪ মাঘ ১৩৪৩ তারিখে স্বতন্ত্র আকারে প্রথম রচিত হয়। কবিতাটির 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৪৪) প্রাক্তন পাঠে উক্ত ছয়টি ছত্র পাওয়া যায় না।

'পলাতকা' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর উদ্দেশে রচিত। পাণ্ডুলিপিতে পত্রের আকারে উহার আরম্ভে সম্বোধন 'বৃদ্ধা', এবং পত্রশেষের স্বাক্ষর 'দাদামশায়'। কবিতাটির 'পুনশ্চ' অংশ 'দাদামশায়ের চিঠি' নামে ১৯৩৬ নভেম্বরের 'শ্রীর্ষ' পত্রের প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কাপুরুষ' কবিতাটি, পাণ্ডুলিপি অনুসারে, শাস্তিনিকেতন হইতে শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে 'কবিসম্রাট' স্বাক্ষরে লেখা হইয়াছিল।

'গৌড়ীরীতি' কবিতাটি ১৩৩৯ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত আকারে ১৩৩৬ চৈত্রের 'বিচিত্রা'য় (পৃ ৪৫৪) বিনা স্বাক্ষরে বাহির হয়—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় তার ধলে,
লোকে তার 'পরে মহা রাগ করে হাতি দেয় নাই ব'লে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায় ফুঁকারে সে "ওহো ওহো",
বলে আঁধি মেজে, "যথেষ্ট এ যে, পরম অনুগ্রহ।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া স্তবের লড়া দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দা-রোপণ— ধন্য ধন্য গৌড়।

কবিতাটির আরম্ভের দুই স্তবক বস্তুতঃ আরও কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা। ১৯২৬ সালে যুরোপ-প্রবাস-কালে বেলগ্রেড হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার বারকে যে-পত্র লেখেন, ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা 'বাতায়ন' হইতে তাহা এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইল—

বেলগ্রেভ,

৭ই নভেম্বর ১৯২৫*

কল্যাণীয়াবরেষু

মর্টু, তোমার চিঠিখানা পড়ে, খুব খুশি হলাম। সাধারণ তো আমাকে অহংকৃত এবং হৃদয়বিহীন বলেই মনে করে। সেই জগ্গেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাই নি। আর সেই জগ্গেই লোকে আমার গ্ৰাঘ্য প্রাপ্য থেকেও যতটা পারে দাম কমাতে চেষ্টা করে। এর ঠিক কারণটা কী আমি তো ভালো বুঝতেই পারি নে। আমি যদি স্বভাবতই কঠিনহৃদয় ও স্নেহসম্পদে রূপণ হতুম তা হলে কবি হতেই পারতুম না। অস্তরে যার রসের অভাব সে কখনোই রসসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু, যখন অনেক লোকের একই ধারণা হচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন বলতেই হবে যে, আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে করে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত আমাদের দেশে হৃদয়াবেগ-প্রকাশের যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গী সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবার একঘরে, সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারে নি। দ্বিতীয়ত ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়বন্ধুর পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির রীতি পদ্ধতি ব্যবহারে একটা স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে কেননা আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এইজন্তে আমাদের দেশে আত্মীয়তা-প্রকাশের যে-সব গলাগলি কোলাকুলি ধরন আছে তাতে আমার হাত পাকে নি। এই-সব কারণে দেশে জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। কিন্তু, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো। বন্ধিম একদিন সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু, আমি তো জানি তাঁর কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না— আমরা কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর গা-ঘেঁষা হবার জো ছিল না। কিন্তু, আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপভব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড বা নগণ্য ব্যক্তি তো বাংলাদেশে কেউ নেই। অথচ বন্ধিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিনহৃদয় বলে নি। কেননা যার কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অসুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তাঁর কাছেই দাবির যোগে আনা পূরণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় বুলি খলি,
লোকে তার 'পরে ভারি রাগ করে হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, 'দাতা বটে যোলো আনা!'

—বাতায়ন, ১৩৩৮ রবীন্দ্রজয়ন্তী

'অটোগ্রাফ' কবিতাটি শ্রীমান অভিজিৎ চন্দ্রের প্রতি 'দাহু' রবীন্দ্রনাথের স্নেহোপহার।

সংযোজন

'প্রহাসিনী'র রচনাবলী-সংস্করণে 'সংযোজন' অংশে বিভিন্ন সাময়িকপত্র হইতে সংকলন করিয়া কতকগুলি নূতন কবিতা যোগ করা হইল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেও দুইটি কবিতা গ্রহণ করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র	ভারতী	১২২৩ ভাদ্র-আশ্বিন
পত্র	ভারতী	১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
স্বগীয় চা-চক্র	শান্তিনিকেতন	১৩৩১ শ্রাবণ
চাতক	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫০ কার্তিক-পৌষ
নাতবউ	বিচিত্রা	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
মিষ্টান্বিতা	পরিচয়	১৩৪২ শ্রাবণ
নামকরণ	প্রবাসী	১৩৪৬ পৌষ
ধ্যানভঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৬ ভাদ্র
রেলোটিভিটি	অলকা	১৩৪৬ ভাদ্র
নারীর কর্তব্য	অলকা	১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
মধুসূদায়ী	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
মাছিত্ব	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬ চৈত্র
কালান্তর	যুগান্তর	১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা
তুমি	নিকরু	১৩৪৭ আশ্বিন
মিলের কাব্য	কবিতা	১৩৪৭ চৈত্র
মশকমল গীতিকা	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

‘নিমন্ত্রণ’ (পৃ ৪৭) ও ‘লিখি কিছু সাধা কৌ’ (পৃ ৬৮) কবিতা দুইটি পাণ্ডুনিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতাটি ‘বাশরী’ নাটকে (১৩৪০ অগ্রহায়ণ) ব্যবহার করা হইয়াছে।

‘পত্র’ কবিতাটি প্রথমসংস্করণ ‘পুরবী’র ‘সঙ্কিতা’ অংশে ১৩৩২ সালে প্রথম সংকলিত হইয়াছিল। (পরবর্তী সংস্করণে ‘সঙ্কিতা’ অংশ ‘পুরবী’ হইতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।) রচনাস্থান-নির্দেশক ‘বনক্ষেত্র’ শব্দটি Woodfield-এর কবিকৃত বঙ্গানুবাদ।

‘স্বসীম চা-চক্র’ কবিতাটির সম্পর্কে অধুনালুপ্ত ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’ হইতে (১৩৩১ শ্রাবণ) ‘স্বসীম চা-চক্র প্রবর্তনা’র বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত হইল—

পূজনীয় গুরুদেব চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তনা করিয়াছেন— ইহার নাম স্বসীম চা-চক্র। স্ব-স্বমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনের বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, ইহা আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপকগণের অবসরসময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো হইবে— যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনার পরস্পরের বোঝসুজ্ঞে দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মতো যেমন-তেরন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসংগতি দান করিবে।

বর্ষাঋতুর জন্ম শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্তী পদে অভিযুক্ত হইলেন। তৎপরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। ইহার পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনীত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করেন।

‘স্বসীম চা-চক্র’ উল্লিখিত সেই ‘নবরচিত গান’— স্বরে গের, অথচ সংস্কৃতের স্তায় স্বরবর্ণের লঘু গুরু উচ্চারণ-সহ কবিতারূপেও পাঠের যোগ্য।

‘চাতক’ কবিতা প্রসঙ্গে, ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র কবিতাটির পরিচয়স্বরূপ মুদ্রিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

এ কবিতাটি গুরুদেব যে প্রসঙ্গে লেখেন তাহা আমার মনে আছে। অধ্যাপকেরা বিছান্তবনের বারান্দায় চা পান করিতেন। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এবং বলাই বাহুল্য তাহাতে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত। আমি বিছান্তবনে আমার কাজ নিয়া থাকিতাম, অত কাহে থাকিলেও আমি খুব কমই ঐ ‘চা-চক্রে’ বসিতাম, চা পান তো করিতামই না। একদিন অধ্যাপকেরা ‘চা-চক্রে’র জন্ম আমার নিকট হইতে ১৫ আদায় করেন। ইহাতে আমার ঐ বন্ধু

‘চা-চাতক’গণ (এ নাম গুরুদেবেরই দেওয়া) ‘চা-চক্রে’র এক বিশেষ ব্যবহা করেন। আর, গুরুদেব সেদিন ‘চক্রেখর’ হইয়া এই আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১৩৮

‘মিষ্টাশ্বিতা’ কবিতাটি শ্রীমতী পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যচ্ছলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই। ১৩৩৫ সালের ৫ জুন তারিখে নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকার পর উক্ত অংশ প্রেরিত হয়—

আমি আশা করেই ছিলাম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীত্বের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪২ পৌষ, পৃ ৩৭৫

‘নামকরণ’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক ‘গল্পসল্প’ গ্রন্থের ‘চণ্ডী’ গল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ‘চন্দনী’ গল্পের শেষে যে কবিতা আছে তাহা এই কবিতার শেষ স্তবকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতনরূপ।

‘নারীর কর্তব্য’ কবিতাটি ‘আমাকালী পাকড়াশী’র ছন্দ-স্বাক্ষরে ‘অলকা’ পত্রিকায় বাহির হয়। এই উপলক্ষ্যে অল্প বহু ছন্দনামও ভাবা হইয়াছিল। এই কবিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ (বৈশাখ ১৩৬৪) গ্রন্থের ২১০-১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

‘মধুসঙ্কায়ী’ কবিতা কয়টি ‘মংপু-নিবাসিনী শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত’। আলোচ্য কবিতাধারার পরিশেষ-স্বরূপ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত ‘পঁচিশে বৈশাখ’ হইতে সংকলন করা হইল—

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পার’
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে,
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে সেই হাতে।
ডাকযোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।

পশুশিখরের পানে কবি মধু-সখা
 উড়েছিল মধুগন্ধে, গগন উপত্যকা
 করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
 প্রয়োজনে । ছুরারোহ তব আসনের
 ঠাই-বদলের আমি করিতেছি আশা,
 সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা ।

১১ মার্চ, ১৯৪০

‘মিলের কাব্য’ নিম্নোদ্ধৃত গল্প ভূমিকা-সহ ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া-
 ছিল—

১৯১১৪১ তারিখের কথা । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায়
 হেলান দিয়ে । আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে,
 তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত ; দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে
 বাধা । আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে । সুধাকান্ত
 বসে আছে পাশের চৌকিতে । হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল । একটা কথা
 শুরু করলুম অকারণে, বলে গেলুম :

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, স্বপ্নঃধের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে
 কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে
 ব’সে ব’সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন । কিছুকাল পরে দেখি,
 সাদা হয়ে গেছে ; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে-অমুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ
 লেশমাত্র তার বেদনা নাই । তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী । সংস্কৃত শ্লোকে
 প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায় । রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের
 বহু কালের নানাবিধ স্পষ্ট অমুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অমুভূতি গেল শূন্য
 হয়ে । তা হলে যা ছিল সে কী ছিল । মন্ত একটা ‘না’ প্রকাণ্ড একটা ‘হাঁ’য়ের
 আকার ধরেছিল । নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে
 নিচ্ছে নিজের মধ্যে । এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে । এই যে ইস্রাজাল
 এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাকর কাব্য বলতে হবে— একের
 উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না । সৃষ্টি জোড়-মিলনের কাব্য ।

গঙ্গের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল ।
 অসুস্থ শরীরে ও আবার একটা অপ্রকৃতিস্বতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে । সুধাকান্ত এরই

ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদলগছায় হাজরে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই...

—কবিতা, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ ১

আকাশপ্রদীপ

‘আকাশপ্রদীপ’ ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে প্রকাশকাল ‘১৩৪৫’ ছাপা হইয়াছিল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির সাহায্যে কয়েকটি কবিতার রচনার কাল ও স্থান সংযোজিত, এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধিত হইয়াছে; ‘বেজি’ কবিতা দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের গ্রীষ্মে আলমোড়ায় অবস্থানকালে রচিত ‘যাত্রাপথ’ কবিতাটি বাদে ‘আকাশপ্রদীপ’এর অন্যান্য প্রায় সমস্ত কবিতা ১৩৪৫ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালের মধ্যে শাস্তিনিকেতনে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রথম প্রচারিত না হইয়া একেবারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। চারটিমাত্র কবিতার পত্রিকায় প্রকাশের সূচী নিয়ে দেওয়া হইল—

জানা-অজানা	প্রবাসী	১৩৪৫ কার্তিক
পাখির ভোজ	প্রবাসী	১৩৪৫ ফাল্গুন
সময়হারা	প্রবাসী	১৩৪৫ মাঘ
‘ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে’	প্রবাসী	১৩৪৬ বৈশাখ

‘যাত্রাপথ’, ‘স্বল-পালানে’, ‘ধ্বনি’, ‘বধু’, ‘ছল’, ‘শ্রামা’, ‘কাঁচা আম’— এই কয়টি কবিতা প্রসঙ্গে ‘জীবনস্মৃতি’র আরম্ভের কয়েক পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য) ও ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশ বিশেষভাবে তুলনীয়।

‘বধু’ কবিতার প্রথম ছত্রটির পূর্ববর্তী কোনো-এক পাঠে পাণ্ডুলিপিতে ‘ঠাকুরমা’ স্থলে ‘মুখুজ্জ’ পাওয়া যায়। ‘জীবনস্মৃতি’তে উল্লিখিত থাকাকি কৈলাস মুখুজ্জের ছড়া বলার বিবরণটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

সেই কৈলাস মুখুজ্জ আমার শিশুকালে অতি দ্রুত বেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগয়ের আশা অতিশয় উজ্জলভাবে বর্ণিত ছিল। এই-ষে ভুবনমোহিনী বধুটি ভবিষ্যতের কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।

আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।

—জীবনস্মৃতি, শিকারস্তু অধ্যায়

‘শ্রামা’ ও ‘কাঁচা আম’ কবিতা দুইটি তথ্যের বিচারে জুড়ি কবিতা। এই প্রসঙ্গে ‘জীবনস্মৃতি’তে বধূসমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু তুলনীয়—

তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধু আসিলেন তখন অস্ত্রপূরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনাব, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।

—জীবনস্মৃতি, প্রত্যাভর্তন অধ্যায়

পাণ্ডুলিপিতে ‘শ্রামা’ কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্ক্তির নিম্নরূপ আদিপাঠ পাওয়া যায়—

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,

বারো ছিল বয়স আমার।

‘জানা-আজানা’ কবিতার ‘প্রবাসী’তে-প্রকাশিত পাঠে সর্বশেষে দুইটি অতিরিক্ত ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল—

তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,

অস্তগিরিশিখরের নকত্রের রহস্যবারতা।

‘যাত্রা’ কবিতাটিতে যে স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে ‘যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বা ভ্রমণের ডায়ারির (বিচিত্র প্রবন্ধ : যুরোপ-যাত্রী) ‘শুক্ৰবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০’ তারিখের অংশটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে ৫৮৭-৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‘সমস্কারা’ কবিতার ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত পাঠের সূচনায় ছিল—

ডাক্তারেতে বলে যখন ‘মরেছে এই লোক’

তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,

কিন্তু যখন বলে 'জীবনমৃত'
সেটা শোনার ভিত্তে ।
আমার ঘটল তাই,
নালিশ তবু নাই ।

বর্তমান গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার 'কখনো বা হিসাব ভুলে' ইত্যাদি ১৫-১৮ সংখ্যক ছত্র 'প্রবাসী'তে নাই; অপর পক্ষে ১১০ পৃষ্ঠার প্রথম দুই ছত্রে যে-স্তবকের শেষ তাহার অসুস্থিস্বরূপ পাওয়া যায়—

শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু এক মহলেই জানা ।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে,
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে ।

ইংরেজি ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীমমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য : আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখি নি, ওটা যে একটা সর্কোতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে ।

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি প্রকাশের পর, যে পুরাতন ছড়া অবলম্বনে উহা রচিত তাহার ঢাকা-ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ 'প্রবাসী'তে (১৩৪৬ আঘাট, পৃ ৩৭৩) সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ নিজে উহার একটি পাঠ বহুকাল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া ১৩০১-০২ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন । আলোচ্য কবিতা প্রসঙ্গে কবির সংগৃহীত সেই ছড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড হইতে (পৃ ৬২৭) নিম্নে সংকলিত হইল—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
হুল্লরীয়ে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে ।
ডাকাত আলো যা,
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে
দেখতে দিলে না ।
আগে যদি জানতাম
ভুলি ধরে কানতাম ।

‘কাঁচা আম’ কবিতার শেষ স্তবকে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্র-বাক্যটুকু প্রণিধান-যোগ্য—

আনো, একবার মাত্র জীবনে গমনা পয়েছিলুম, আংটি। নতুন বোঁঠান দিয়েছিলেন, গাঙ্গিপুয়ে গঙ্গার চান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব ছুঁধ হয়েছিল।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, সং ১, পৃ ২০৫

চণ্ডালিকা

‘চণ্ডালিকা’ নাটিকাটি ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাদ্রের শেষে কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ উহা আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহার আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street. 1882) গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। ‘ভূমিকা’য় গল্পটির যে-অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রথমার্ধমাত্র। গল্পের শেষার্ধ মূল গ্রন্থ হইতে কোতূহলী পাঠকদের জন্ত নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ānanda daily went to the city for alms. Ānanda came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and Ānanda, followed by the girl, ran back to the hermitage, and reported the occurrence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, “You want to marry Ānanda. Have you got the permission of your parents? Go, and get their permission.” This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents’ permission. The Lord then said, ‘Should you wish to marry Ānanda, you must put on the same kind of ochre-coloured vestment which he uses.’ She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on ochre-coloured cloth, divested of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called

sarva dūrgati-sōdhana-dhārani, the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.

—The Sanskrit Buddhist Literature, p 224

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনেই পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় ‘চণ্ডালী’ নামে সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় (১৩১০ মাঘ, পৃ ৪৪২-৫৪) কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘চণ্ডালিকা’ প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উহাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে ‘চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য’ প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী পঞ্চবিংশ খণ্ডে ‘চণ্ডালিকা’র উক্ত রূপান্তর মুদ্রিত হইয়াছে।

তাসের দেশ

‘তাসের দেশ’ বাংলা ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয়-সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল—

প্রথম অভিনয়

ম্যাডান থিয়েটার

২৭শে, ২৮শে, ও ৩০শে ভাদ্র

: ৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে ‘তাসের দেশ’এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা কহল পরিমাণে ‘সংশোধিত ও পরিবর্ধিত’ সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনা প্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ ‘তাসের দেশ’ সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রথম সংস্করণের ‘ভূমিকা’ অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে ‘প্রথম দৃশ্যে’ পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৬৩) নূতন সংযোজিত হইয়াছে। রাজপুত্রের ‘আমার মন বলে চাই চাই গো’ (পৃ ১৬৩) গানটি প্রথম সংস্করণে ‘তোমার মন বলে চাই চাই গো’ ইত্যাদি পাঠান্তরে রাজপুত্রের

মাঝের গানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে, সম্পূর্ণ তৃতীয় দৃশ্যটি এবং নিম্নে নির্দেশিত আটটি গান নূতন যোগ করা হয়—

- ১। খর বায়ু বয় বেগে
- ২। গোপন কথাটি রবে না গোপনে
- ৩। ভোলন নামন (তাসের কাওয়াজ)
- ৪। বলো, সখী, বলো তারি নাম
- ৫। অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে
- ৬। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
- ৭। গগনে গগনে যায় হাঁকি
- ৮। বাধ ভেঙে দাও, বাধ ভেঙে দাও

রাজার মুখের ছড়া বা 'শাস্ত্রের ছন্দ'টিও ('শাস্ত্র বেই ছন্দ', পৃ ১২০) নূতন। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত এই চারটি গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে—

- ১। হারে রে রে রে রে
- ২। হে মাধবী, বিধা কেন
- ৩। হে নিকুপমা
- ৪। তুমি কোন পথে যে এলে, পথিক

১৭৪ পৃষ্ঠার শেষে মুদ্রিত রাজপুত্রের স্তবগানটি প্রথম সংস্করণে পূর্ণতর আকারে এইরূপ ছিল—

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস ।
 ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস ।
 তাম্বকুট-ঘন-ধূম-বিলাসী,
 তন্দ্রাতীরনিবাসী—
 সব-অবকাশ-ধ্বংস
 সমরাজেরই অংশ ॥

'তাসের দেশ' রচনাটি, ১২২২ আষাঢ়ের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের ১৭২-৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গল্পগুচ্ছ

সংকলিত সকল গল্পই 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সাতটি গল্প যথাক্রমে বাংলা ১৩২১ সনের বৈশাখ-কার্তিক সাত মাসে এবং বাকি তিনটি গল্প ১৩২৩ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং পৌষ মাসে। প্রথম সাতটি গল্প প্রথমতঃ গল্পসপ্তক (১৩২৩) গ্রন্থে সংকলন করা হয় এবং পরলা নম্বর (১৩২৭) গ্রন্থে সংকলিত হয় 'তপস্বিনী' ও 'পরলা নম্বর'। 'পাত্র ও পাত্রী'র প্রথম সংকলন বিশ্বভারতীসংস্করণ গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে (১৩৩৩) ; উহাতে পূর্বোক্ত নয়টি গল্পও পুনর্মুদ্রিত হয়।

'স্বীর পত্র' প্রকাশিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যসমাজে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল ; তৎকালীন নারায়ণ প্রভৃতি পত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পটিকে 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩২) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

'বোষ্টমী' গল্পের বোষ্টমীর উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস সম্পূর্ণ ই কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে তাহার কিছু মূল আছে, সে সম্বন্ধে অল্পসঙ্কিৎসু কোনো পাঠিকার প্রশ্নোত্তরে লিখিত এই পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্য। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় — সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।

—পত্রধারা, প্রবাসী, ১৩৩৯ শ্রাবণ, পৃ ৪৫১

সাহিত্যের পথে

'সাহিত্যের পথে' বাংলা ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেই অঙ্গুসারে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইল। সাময়িকপত্রে প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাস্তব	সবুজ পত্র	১৩২১ শ্রাবণ
কবির কৈফিয়ত	সবুজ পত্র	১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ বৈশাখ
তথ্য ও সত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ ভাদ্র
সৃষ্টি	বঙ্গবাণী	১৩৩১ কার্তিক

সাহিত্যধর্ম	বিচিঞ্জা	১৩৩৪ শ্রাবণ
সাহিত্যে নবত্ব ^১	প্রবাসী	১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
সাহিত্যবিচার	প্রবাসী	১৩৩৬ কার্তিক
আধুনিক কাব্য	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
সাহিত্যতত্ত্ব	প্রবাসী	১৩৪১ বৈশাখ
সাহিত্যের তাৎপর্য	প্রবাসী	১৩৪১ ভাদ্র

‘বাস্তব’ ও ‘কবির কৈফিয়ত’ প্রবন্ধ দুইটির প্রথমসংস্করণে-মুদ্রিত চলতি ভাষার পাঠের পরিবর্তে ‘সবুজ পত্র’ মাসিকে প্রকাশিত সাধুভাষায়-লিখিত মূলপাঠ সংকলিত হইয়াছে। ‘বাস্তব’ প্রবন্ধের আরম্ভের নূতন অঙ্কচ্ছেদটিও ‘সবুজ পত্র’ হইতে। উক্ত প্রবন্ধটির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, “আজকাল বাংলাদেশে কবির যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না” এমন কথা “একেবারে আমারই নাম ধরিয়া” কেহ কেহ প্রয়োগ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৯৫-২০৩) ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’ এবং ‘সবুজ পত্র’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২১ মাঘ, পৃ ৬৯৮-৭১০) ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ প্রবন্ধ দুইটি দ্রষ্টব্য।^১ ‘প্রবাসী’র প্রবন্ধটিতে লেখক সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, “রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নহে”; “রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্তের মধ্যে ‘বিশ্বাসের ছবি’ আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।”

‘সাহিত্য’, ‘তথ্য ও সত্য’ এবং ‘সৃষ্টি’— এই তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩০ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা। সেনেট হলে বক্তৃতা হইবার অব্যবহিত পরে প্রথম দুইটি বক্তৃতার অমূল্য অমূল্য ‘সাহিত্যের মূলতত্ত্ব’ ও ‘সাহিত্যের রসতত্ত্ব’ নামে ১৩৩০ ফাল্গুনের ‘পরিচারিকা’ পত্রিকায় সর্বাঙ্গ্রে বাহির হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটি ‘সাহিত্য’ নামে ১৩৩১ বৈশাখের ‘পল্লীশ্রী’তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সালে ‘প্রবাসী’র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় ‘কষ্টিপাথর’ অংশ (পৃ ২০১-০৩ ও ৩৪৮-৫২) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্ভবত উক্ত অমূল্য অমূল্য যথাযথ হয় নাই বিবেচনা করিয়া ‘বঙ্গবাণী’র অল্প রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বক্তৃতা তিনটি লিখিয়া

১ ‘প্রবাসী’তে প্রবন্ধের মূল নাম ‘বাজীর ডারারি’

২ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ‘বর্তমান বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে সংকলিত

দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রবন্ধটির কয়েকটি বর্জিতাংশ 'বন্ধবাণী' হইতে নিয়ে মুদ্রিত হইল।—

সূচনাংশ

আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে কিছু বলব। এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আমার প্রকৃতিগত।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, বাল্যকাল হতেই আমি স্কুল পালিয়ে বেড়িয়েছি, পারৎপক্ষে বিদ্যালয়মন্দিরের সীমানায় ধরা দিতে চাই নি। এখন আমার এই বয়সে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হল তখন দিনের পর দিন কেবলই আমার প্রতিশ্রুতির দিন পিছিয়ে দিচ্ছি— ওটা সূত্র ভীষণতাবশত।

আজকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে হলে শ্রোতা ও বক্তার সম্মান-রক্ষার্থে লিখে বলাই উচিত। নিজে নানা দিক থেকে চিন্তা ক'রে, আর এই বিষয়ে অন্ত অন্ত সবাই কে কী বলেছেন তা সংগ্রহ ও তুলনা ক'রে, আলোচনাটা বেশ ভালো রকম ক'রে করা উচিত। এই-সব নানা কথা ভেবেই তো আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি।

ক্রমশই দেখছি, লেখার বয়স চলে যাচ্ছে। কতকাল থেকে ক্রমাগত লেখনী চালাচ্ছি, এখন লিখে লিখে একটা রাস্তি আমাকে অভিবৃত্ত ক'রে ফেলেছে। তা ছাড়া আমি কর্মজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছি।

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহমানভাজন আমাদের সভাপতি-মশায়' আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি জানালেন যে, আমার তিনটি বক্তৃতার মধ্যে অন্তত একটা যেন বলে যাই। আমি তখন বললেম, 'আমার যা বলবার তা যদি আপনারা মুখে বলতে দেন তবে হয়তো আমি চেষ্টা করতে পারি।' তিনি তাতেই সম্মতি দিলেন। তাই আজ সাহস ক'রে 'আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি, আপনাদের কাছে মুখে বলবার স্পর্ধা আমার স্বভাব-সংগত নয়।

মনে করেছিলেম, আমি তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে ব'সে ব'সে কিছু বলব। হয়তো দুই-তিন শো ছাত্র হবে— তাদের মোকাবিলায় সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে সহজভাবে কিছু আলাপ ক'রে যাব। তাই সাহস ক'রে রাজি হয়েছিলাম।

যখন মুখে বলি তখন অনেক সময়ই চিন্তা ক'রে বলতে পারি নে— তার কারণ আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতা। লোকে থাকে পয়েন্ট বা ব্যাখ্যানসৃষ্টি বলে সে-সব আমি মনে ধারণ করে রাখতে পারি নে। বলবার সময় সৃষ্টিগুলি হারিয়ে তার পরে সেই হারাধনের পিছনে পিছনে মনকে হঠাৎ দৌড় করতে পাঠালে, আসল কাজটার বড়ো ব্যাঘাত ঘটে। তাই দুর্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ ক'রে দিই। অর্থাৎ, সেই সময় যেমন চিন্তার ধারা আসে তারই অনুবর্তন করে যাই। এ ছাড়া অন্য উপায় আমার হাতে নেই।

আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। আর-কিছু না হোক, অল্পত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। এই সম্বন্ধে অন্য মনীষীদের আলোচিত উপদেশে যদিও কিছু শিক্ষা করতে পারি নি, তবু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। নিরন্তর সাহিত্যপ্রবাহ ব'য়ে ব'য়ে আমার অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে যে-পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে। আপনা হতেই সেটা হবে এই আশাতেই আজ এখানে এসেছি।

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র— ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র— হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। ব'লে ইংরেজিতে শুরু করলেন : Is art too good for human nature's daily food ?

বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে-সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদৃঢ় করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনো প্রকার সমস্টিপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নই আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন ক'রে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।

এর উত্তর দিতে গেলে আর্ট সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত গোড়া ঘেঁষে কথাটা বলতে হবে। নইলে কোনো ছোটো নিস্পত্তিতে চলবে না। নিজেকে অজ্ঞানসা করতে হবে কলাকার সম্বন্ধে মানুষের এত বিচিত্র প্রয়াসের তাৎপর্যটা কোথায় আছে। যুগযুগান্তর থেকে মানব এই যে-সকল রূপরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আছে, যে-রচনা চিরকাল ধ'রে সকলের বহুপূরস্কৃত, মানবের সেই চেষ্ঠার মূল উৎস কোথায়। তা যদি ঠিকমতো নির্ণয়

করতে পারি তা হলেই বুঝতে পারব, আর্টের সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ কী এবং মানুষের প্রাণধারণের চেষ্টার পক্ষে তার উপযোগিতা কতটুকু।

এই মূল অনুসরণ করতে গেলে মধ্যপথে ধামবার জো নেই, একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় অসৌমের রাজ্যে। সত্যের সন্ধানে অসৌমের পথে অভিযান আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিগত; হয়তো কোনো ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনাকে এত সূদূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে আমার সংকোচ হত। যদি বা সাহস ক'রে এ কাজে প্রবৃত্ত হতাম তা হলে গোড়াতেই 'ওরিএন্ট্যাল মিস্ট্রিসিজ্‌ম্' নামধারী এক স্বরচিত কুহেলিকার অন্তরাল থেকে হয়তো আমার কথাগুলিকে তাঁরা কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অস্পষ্ট ক'রে শুনতেন। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে আমার ভরসার কারণ এই যে, আমাদের পিতামহেরা আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকেই একটি চিরস্থান সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

এই অনুশীলনায় তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। যে-কোনো অভিব্যক্তি কলায় সংগীতে সাহিত্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকে অনন্তত্বের পটভূমিকার উপর রেখে দেখতে পারলেই সত্যকে পাওয়া যায়— এই কথাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

মানবীয় সত্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায় নেই।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৩-০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই শেষোক্ত কথাটি আজ বিশেষ ভাবে আলোচ্য। যিনি বলেন আর্টের পরিচয় মানবের সংসারযাত্রার সঙ্গে একান্তভাবে সংগত, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই ভাবের সূত্রটিই তার প্রধান অবলম্বন— তাঁর এ কথাটা কি গ্রহণ করা চলে। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ-ব্যাপারের সঙ্গে সংগত ক'রে দেখলেই কি তাকে সত্যরূপে দেখা হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সূচনাংশ

প্রাত্যহিক প্রাণধারণের নানা ব্যাপারের সঙ্গে যে আর্ট মেলে না— এ কথা বলা চলে না। পূর্বেই বলেছি, সত্যের তিন ভাগের মধ্যে আদান-প্রদানের ঐক্যপথ আছে। অর্থাৎ, তাদের মিলের মধ্যে সত্য আছে। তেমনি আবার তাদের বিভাগের মধ্যেও

সত্য আছে। আমাদের জ্ঞান এক দিকে আমাদের প্রাণধারণ-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।
টিকে থাকবার জন্যই আমাদের অনেক কিছু জানা চাই। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা
বলতে পারি নে যে, যে-সকল জানা আমাদের টিকে থাকার পক্ষে একান্ত উপযোগী
নয় সেই-সকল জানা নিকৃষ্ট। বস্তুত...

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০১-০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে বস্তুত অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মকে যে অনন্তস্বরূপ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে তারও পরিচয় আছে। এই
পরিচয়ের দ্বারা মানুষ আপনার প্রয়োজনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, তৃতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বাক্যের পর

এমন কি, 'যেমন ক'রে হোক আমি নিজে টিকব', 'অন্তের যা হয় হোক'—
এ ইচ্ছাটা থাকে না।

বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

পৃথিবীতে যে-মানুষ বলেছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', সেই কৃপণ দীর্ঘজীবী
হতে পারে, ধনী হতে পারে, কৃচ্ছসাধনে আশ্চর্য শক্তি দেখাতে পারে— কিন্তু সে
কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। ভূমা আমাদের ঐক্যবোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, যে-
সত্যের সম্বন্ধিকে প্রভূত ও সমুজ্জ্বল করে তোলে সেই সত্য-ক্ষেত্রেই আর্টের ফসল ফলে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন
দেখছি— তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই।
বহু শতাব্দীর এই-সব মহামন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও
যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়। সেই উপনিষদ্ ব্রহ্মের আর-একটি স্বরূপের উল্লেখ
ক'রে বলেছেন— অনন্তম্। এইখানেই আছে প্রকাশভঙ্গ।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩৭০

রচনাবলী পৃ ৩৭৭, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই অগতে আওরঙ্জের একদা সুদীর্ঘকাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ক'রে ভারতকে
কম্পাঙ্কিত ক'রে দিয়ে গেছে; কিন্তু তাকে কি কেউ গ্রহণ করেছে। তা হলে পৃথিবীর

কালো অক্ষরের কীট-দংশনের নিত্যদংশনের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় সে আছে ? কিন্তু তার যে ভাই দারাকে অকালে বধ ক'রে নিজের সিংহাসনের সোপানকে সে রক্তকলঙ্কিত করেছে তাকে যে আমরা আমার ব'লে আমাদের অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছি। সেই দারার জীবনটিই কি কাব্য নয়, সংগীত নয়। কেন তাকে কাব্যের সঙ্গে, সংগীতের সঙ্গে তুলনা করছি। কেননা, তার আসন যে নিখিলের করুণার মধ্যে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৮

রচনাবলী পৃ ৩৮১, সর্বশেষ অনুচ্ছেদের শেষে

যদি হয় তো হোক সেটা অবাস্তব কথা। তাতে যদি লজ্জা পাবার কোনো কারণ থাকে তবে সে লজ্জা কবির নয়, রূপদন্ডের নয়, সে লজ্জা তাঁরই যিনি অনন্তং, আনন্দ-রূপমমৃতং ষদ্বিভাতি— সেই লজ্জা পরমসুন্দরের— সেই লজ্জার বিশ্বের প্রকাশ !

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩১২

বর্তমান গ্রন্থে ৩৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (অমৃতের ছুটি অর্থ ইত্যাদি) 'বঙ্গবাণী'র। প্রথম সংস্করণে উক্ত অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হইয়াছিল—

এই ঝড়ের মূর্তি তো মিলিয়ে গেল। একদা আমার স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সেদিন বিরাট আকাশপটে যে-প্রমত্ততার প্রলয়চিত্র রচিত হয়েছিল, সে বাহ্যত ষত স্বল্পস্থায়ী হোক, সেই কণকালের মধ্যেই ছিল অমৃতের প্রকাশ। চটকলের পাশে যে নোংরা বসতি আছে সময়ের পরিমাপে সে বড়ো হলেও সে মরেই আছে।

—সাহিত্যের পথে, প্রথম সংস্করণ, পৃ ২

৩৭২ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রার পথে যে 'দারুণ ঝড়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সমসাময়িক বিবরণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে ৩২২ পৃষ্ঠায় (জাপানযাত্রী। ২ই জ্যৈষ্ঠ) পাওয়া যাইবে। চীনসমুদ্রে উক্ত ঝড়ের প্রেরণাতেই তিনি 'তোমার তুবন-ছোড়া আসনখানি' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তোমার জাহাজ হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

কাল রাতে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল— ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, 'প্রাণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে, পড়ুক ঝ'রে',

তার পরে 'বীণা বাজাও', তার পরে 'পূর্ণ আনন্দ'— কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টকর দিয়ে চলল, তখন একটা নতুন গান বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম, শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাজি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। সেটা নিচে লিখে দিচ্ছি। বেহাগ, তেওরা।

—প্রবাসী, ১৩৪২ আশ্বিন, পৃ ৮৫৪

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (১৩৩৪ আষাঢ়) পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-ভ্রমণে বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে রচনা করেন। ইহার কয়েক মাস আগে (১৯২৬ ডিসেম্বর) দিল্লিতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীঅমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে 'অতি আধুনিক বাংলাকথাসাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক মহলে নানা দিক হইতে উহার সমালোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ ভাদ্র, পৃ ৩৮৩-৯০) ও 'কৈফিয়ৎ' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮২২-২৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী, ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ ২৩৭-৪৬), এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ ৫৮৭-৬০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরের রচনা। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর উহা প্রকাশিত হইলেও (প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), প্রবন্ধটি বিদেশে জাভা হইতে বালি যাইবার পথে প্লান্সিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে ১৩৩৪ সনের ভাদ্র মাসেই লিখিত। এটি এক হিসাবে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক। 'প্রবাসী' হইতে কয়েকটি বর্জিত অশুদ্ধ উদ্ধৃত হইল—

রচনাবলী পৃ ৪০৮, প্রবন্ধের সূচনাংশ

শান্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব— সৃষ্টির মূলবাণী এই।

কিন্তু, এই বলার মধ্যেই আছেন ছুই— যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন,, সৃষ্টিকর্তার নিজের অন্তরেই এই বলিয়ে আর এই শুনিয়ে, ছু পারে ছুজন— মাঝখানে সৃষ্টিকর্তা।

মর্তনোকের লেখার মধ্যেও সেই একই কথা। সামনা-সামনি আছে ছুজনে— একজন বলে, একজন শোনে। যে শোনে তারই দাবির হাঁচে বলার আকৃতি-প্রকৃতি অনেকখানিই ঢালাই হয়, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা শক্ত। যদি পুঁইশাকের খেতের মালিক তার বুড়ি নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় তা হলে ব্যাবসাদার কখনো জাহাজের

কাপ্তেনকে খবর দেবার কথা মনেই আনতে পারে না ; তার দাবি আপনিই হাতে ধাবার ডিঙি বা ডোঙার তলব করে ।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

রচনাবলী পৃ ৪১১, ষষ্ঠ ছত্রে 'বথার্থ যে বীর' ইত্যাদির পূর্বে

তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন । এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ । অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় ভাল-ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই ।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

রচনাবলী পৃ ৪১২, চতুর্থ ছত্রের পর ষতন্ত্র অনুচ্ছেদ

শৈলজ্ঞানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি । দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের বথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনার দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই । তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্ষাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের শখের ষাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি । 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি— দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই । তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি ।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

পূর্বদীপপুঞ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লেখেন ; প্রাসঙ্গিকবোধে উহার শেষাংশ নিয়ে সংকলিত হইল—

'সাহিত্যধর্ম' ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি । তার কর্মফল চলছে । তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরও একটা লেখা হয়েছে । তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে— এতে ক'রে যে একটা আলোড়ন আনিয়াছে তাতে কতি নেই । কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যালোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে । সিদ্ধান্তে পৌছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়— দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিরন্তরচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে । যাহুবের মন শেষ কথায় বধন এসে

পৌছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ করতে মানুষের আপত্তি আছে ; কেননা, মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্তে বারে বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেয়ে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে— যুগে যুগে তাই চলছে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্তে নয়, চাওয়ার জন্তেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো ; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু— কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেক কালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত ক'রে সন্দেহ করে— তার পরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।

—অনামী, পত্রগুচ্ছ, পৃ ৩৪৩

‘সাহিত্যবিচার’ প্রবন্ধটি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষৎ-সভায় প্রদত্ত মৌখিক ভাষণের কবির স্বকৃত স্মৃতিলেখন। প্রবন্ধটির বর্জিত আরম্ভভাগ ‘প্রবাসী’ হইতে সংকলিত হইল—

রবীন্দ্রপরিষৎ সভায় ‘সাহিত্যবিচার’ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্তে আমার পূর্বে অসুযোগ আছে। মুখে-বলা কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতি-শক্তিশালী লোক এক দিনের কথিত বাণীকে অন্য দিনে যথাযথরূপে অস্মৃতিতে অক্ষয়। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অসুখাবনের বৃথা চেষ্টা না ক'রে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বৃষ্টি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো ; আর বিচারটি হল পরিচয় — তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। কিন্তু, পরিচয় তো অনেকরকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক পরিচয়ের জায়গায় আর-এক পরিচয় দাখিল করি, যেখানে এক মাস জল আনা আবশ্যিক সেখানে ‘তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল’। জলের চেয়ে বেলে তার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার নামও বেশি, কিন্তু যে তৃষার্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্যবিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। কল্পনা করা যাক, আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে বিচারক হয়তো গর্ব করে বলে উঠবেন, জাতিতে উনি বৈষ্ণব। জিজ্ঞাসু বলবেন, 'এহ বাহু'। তখন বিচারক আবার গর্ব করে বলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন, তার পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর। জিজ্ঞাসু আবার বলবেন, 'এহ বাহু'। তখন বিচারক সুর আরও চড়িয়ে বলবেন, উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। হায় রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে এ-সব তথ্য সবদে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রসসাহিত্যে এগুলিকে সবদেই বর্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মৌকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েছে, তখন তিনি নিজের কিরকম চিকিৎসা করতেন। বাল্মৌকি তাঁর অটোম্যান নিরে চূপ করে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রামচরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসাপদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে শুকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েছে, তথাপি সেটা সপ্ত কাণ্ডের কম হল না।

আমি যে-কথাটি বলতে গিয়েছি সে হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩১

এই গ্রন্থের ৪১৫ পৃষ্ঠার অষ্টাদশ ছত্রের পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায় : তৃষ্ণার্তের জন্তে আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩২

এই গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠার শুরুতে যে অহুচ্ছেদ শেষ হইয়াছে তাহার অহুবৃত্তিরূপ 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়—

কথা যখন উঠল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বললে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে সংবাদ পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সস্তর রসঃ এবং তম এই তিন গুণের মধ্যে রসোত্তমগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুত্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অল্পটই বলেই সেটা শুনে হই খুব মস্ত। এ-সব কথা জারি ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্র-মান্য দেশে এতে করে লোকেও সন্তুষ্ট হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্যবিচারে এ-সব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠলই, তা হলে এ কথা

মানতেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিন গুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখার কোথাও দেখা দেয় তম, কোথাও বা রজ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজটাই সব-চেয়ে বেশি এ কথা প্রমাণ করতে যারা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ লেখা ও লেখা, এ লাইন ও লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাহিত্যিক বলে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাহিত্যিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী ক'রে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু, সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী। উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষারূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাক্বেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি, কিম্বা সাংখ্যদর্শনের সব গুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, এ কথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাহিত্যিক যে-কোনো গুণই তাতে থাক বা না থাক সবসুধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। প্রতিভার কোন্ মন্ত্রবলে তা হল তা কেউ বলতে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদানবিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো, এ নিয়ে মুক্তিভঙ্গ-ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভালো নেই।

কাঁটাগাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপ-গাছের প্রকৃতিটা অসুধারী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুলতে পারে না। এই সন্দেহচক্লভ ভাবটা সাহিত্যিক শাস্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না; নিষ্ফলক অতিশুল্ল ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হয় এ কথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভূঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্বরণ করিবে তাকে সাংখ্য-তত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে-দোষটা সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারই একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি ইত্যাদি

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩৩

‘সাহিত্যতত্ত্ব’ ও ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি ১৩৪০ সালের শেষে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৩৪১ সালের আরম্ভে (১৬ জুলাই ১৯৩৪) পঠিত হয়।

‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধটির ‘প্রবাসী’তে মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থ-প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটির উক্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত হইল।

পরিশিষ্ট

‘সাহিত্যের পথে’র প্রথম সংস্করণে ‘পরলোকগত লোকেন পালিতকে নিপিত’ রবীন্দ্রনাথের চারখানি পত্রের কিয়দংশমাত্র ‘পরিশিষ্ট’ আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯৮-৯৯ সালে প্রথম বর্ষের ‘সাধনা’ পত্রিকায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্রোত্তর সহ উক্ত ‘সাহিত্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র’গুলি মাসে মাসে প্রকাশিত হয় (সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন হইতে ১২৯৯ ভাদ্র ও আশ্বিন দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে (পৃ ৪৬৩-৮৮) ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে পত্রগুলির ‘সাধনা’র প্রকাশিত সম্পূর্ণতর পাঠ ‘পত্রালাপ’ নামে ইতিপূর্বেই সংকলিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হইল।

‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক কয়েকটি সাহিত্য-বিষয়ক রচনা, অভিভাষণ ও আলোচনার বিবরণ, বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সংকলন করিয়া রচনাবলী-সংস্করণে নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হইল। সাময়িক পত্রে উহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সভাপতির শেষ বক্তব্য	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যসম্মিলন	প্রবাসী	১৩৩৩ বৈশাখ
কবির অভিভাষণ	প্রবাসী	১৩৩৪ ফাল্গুন
সাহিত্যরূপ	প্রবাসী	১৩৩৫ বৈশাখ
সাহিত্য-সমালোচনা	প্রবাসী	১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ
পঞ্চাশোধর্ম	বিচিত্রা	১৩৩৬ ফাল্গুন
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ

‘সভাপতির অভিভাষণ’ ও ‘সভাপতির শেষ বক্তব্য’— কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কথিত বক্তৃতার শ্রীপ্রমোদকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক ‘আংশিক অমূলিখন’। বক্তৃতা দুইটি ইংরেজি ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে ৩ ও ৪ তারিখে প্রদত্ত হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের শিউড়ি-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন, এইরূপ কথা হইয়াছিল। 'সাহিত্যসম্মিলন' সেই উপলক্ষে রচিত হয়।

'কবির অভিভাষণ' প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীশ্বেতনাথ দাসগুপ্তের অভ্যর্থনার উত্তরে বলা হইয়াছিল। আলোচ্য রচনাটি উক্ত মৌখিক অভিভাষণের কবির স্বকৃত অমূল্য লেখন। ১নং 'রবীন্দ্র-পরিষদ-নিষ্কাশিত'-রূপে 'রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ' নামে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উত্তোগে অমূল্য আলোচনাসভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিবরণ। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগিয়াছিল (শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পূর্বসংকলিত পত্র দ্রষ্টব্য) তাহার পরিণামে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে যথাক্রমে ৪ ও ৭ তারিখে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উপরোক্ত দুইটি অধিবেশন জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে অমূল্য হইয়াছিল। সভার আলোচনায় সূত্রধারের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদন করেন।

'পঞ্চাশোদধর্ম' বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের কলিকাতায় ভবানীপুরে অমূল্য উনবিংশ অধিবেশনের স্মৃতি (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) লিখিত অভিভাষণ। সে সময়ে বাংলার বাহিরে বাস্তব থাকায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বা অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। রচনাটি অনতিবিলম্বে 'বিচিত্রা'র বাহির হয়।

'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) উদ্বোধন অভিভাষণ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অজানা স্বর কে দিয়ে যায় কানে কানে ...	১৮২
অটোগ্রাফ ...	৩২
অনাদৃতা লেখনী ...	২৫
অনেক দিনের এই ডেস্কে ...	১০৩
অস্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত ...	৪৮
অপরিচিতা ...	২২৩
অপাক-বিপাক ..	১২
অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ	১৭
আকাশপ্রদীপ ...	৭৫
আধুনিক কাব্য ...	৪২০
আধুনিকা ...	৫
আমগাছ ...	২৮
আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র ...	১৭১-৭২
আমরা নূতন যৌবনেরই দূত ...	১৭৩
আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো ...	৪৩০
আমার মন বলে, চাই চাই গো ...	১৬৫
আমি তারেই জানি তারেই জানি ...	১৪২
আমি তোমারি মাটির কন্ঠা ...	১৫০
আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে ..	১৮০
ইচ্ছে । সেই তো ভাঙছে ...	১২১
ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাই	১০৪
উজ্জল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হারখানি ...	৮২
উত্তল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে	১৮৩
এ তো বড়ো রক্ত, জাহ্নু ...	১১
এ তো সহজ কথা ...	২৮
এ-ঘরে ও-ঘরে ষাবার রাস্তায় সিঁক মাংসের গন্ধ	৪২৬
এই ঘরে আগে পাছে ..	২৪
এই সবুজ পাহাড়গুলির মধ্যে থাকি কেন ...	৪২৭

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ	...	৪৪৬
একদিন মুখে এল নূতন এ নাম	...	১১২
এলেম নতুন দেশে	...	১৬৭
ঐ ছাপাখানাটার ভূত	...	৬৫
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি	...	১৩২
ওগো, শাস্ত পাষণমূর্তি স্নানরী	...	১৭৭
ওরে মন, যখন জাগলি না রে	...	২৮১
কবির অভিভাষণ	...	৪৮৬
কবির কৈফিয়ত	...	৩৬৮
কলকতামে চলা গয়োর সুরেনবাবু মেরা...		৪১
কাঁচা আম	...	১২৪
কাপুরুষ	...	৩১
কালাসুর	...	৬৩
কী রসসুখা-বরবাদানে মাতিল সুধাকর	...	৪৬
কেন নমন আপনি ভেসে যায়	...	১৮৮
কোথা তুমি গেলে যে মোটরে	...	২৮
খবর এল, সময় আমার গেছে	...	১০৬
খর বায়ু বয় বেগে	...	১৫২
খুলে আজ বলি, ওগো নব্য	...	৩২
গগনে গগনে যায় হাঁকি	...	১৮২
গরঠিকানি	...	২০
গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার	...	৫৩১
গোধূলিতে নামল আধার	...	৭৫
গোপন কথাটি হবে না গোপনে	...	১৬৩.
গোঁড়ী রীতি	...	৩১, ৫৩৩
ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে	...	১৮১
চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো	...	১৩৮
চলতি ভাষায় ধারে ব'লে থাকে আমাশা	...	১২
চলো নিয়ম-মতে	...	১৭৪
চাতক	...	৪৬

চিঠি তব পড়িলায়, বলিবার নাই মোর ...	৫
চিঁড়েতন, হর্ডন, ইঙ্কাবন ...	১৭৫
কয়েছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া ...	৮২
কয় কয় তাসবংশ-অবতংস ...	১৭৪, ৫৪৪
কল ...	৮৬
জানা-অজানা ...	২৪
ঠাকুরমা ক্রততালে ছড়া যেত প'ড়ে ..	৮৪
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে ...	১১৫
তথ্য ও সত্য ..	৩৮২
তপস্বিনী ...	৩০৭
তর্ক ...	১১৭
তল্লাস করেছিনু, হেধাকার বৃক্ষের ...	৫২
তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল ...	১২৪
তুমি ...	৬৫
তুমি সূন্দরী এবং তুমি বাসি ...	৪২৪
তুলনার সমালোচনাতে ...	৫৩
তৃপাদপি সুনীচেন ..	৬২
তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা ...	১২
তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে ...	৬৩
তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে	১৮২
তোলন নামন, পিছন নামন ...	১৬৮
দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে ...	১২১
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার ..	১৪৭
দূর হতে কয় কবি ...	৬০
দেয়ালের ঘেবে যারা ...	৫০
দোষী করো, দোষী করো ...	১৪৩
ধরাডলে চঞ্চলতা সব-আগে নেমেছিল অলে	৮৬
ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির বাঁটায় ...	৩
ধনি ...	৮২
খ্যানভঙ্গ ...	৫২

নয় দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে ...	৪৩০
না না, ডাকব না, ডাকব না ...	১৪০
নাভবউ ...	৪৮
নামকরণ ...	৫০, ১১২
নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি	৬৭
নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে	১১৭
নারীপ্রগতি ...	১০
নারীর কর্তব্য ...	৫৪
নাসিক হইতে খুড়ার পত্র ...	৪১
নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ...	৩১, ৫৩৩
নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিস্থ ...	৩১
নিমন্ত্রণ ...	৪৭
নীল জল... নির্মল চাঁদ ...	৪৩০
নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন ...	৫২১
পঞ্চমী ...	২২
পঞ্চাশোধর্ম ..	৫১৩
পত্র ...	৪২
পত্রদূতী ...	৫৩১
পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায় ...	১৫২
পদ্মাসনার সাধনাতে ছুয়ার থাকে বন্ধ ...	৫২
পয়লা নম্বর ...	৩১২
পরিণয়মঙ্গল ...	১২
পলাতক ...	২৮
পাকুড়তলির মাঠে ...	১১৫
পাথির ভোজ ...	২৯
পাড়ার কোথাও যদি কোনো মৌচাকে ...	৫৮
পাত্র ও পাত্রী ...	৩৩৩
পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে	৪৫৫
পুরুষের পক্ষে সব তত্ত্বমন্ত্র মিছে ...	৫৪
প্রজাপতি ঝাঁদের সাথে ...	৪৭

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৫৬৩

প্রশ্ন	...	২৬
ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে	...	১৫৮
বক্ষিত	...	২৭
বধু	...	৮৪
বলে দাঁও জল, দাঁও জল	...	১৩৭
বলো, নখী, বলো তারি নাম	...	১৭৮
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	...	৫২০
বাঁধ ভেঙে দাঁও, বাঁধ ভেঙে দাঁও	...	১২৩
বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে	...	২৬
বাস্তব	...	৩৬১
বিজয়মালা এনো আমার লাগি	...	১৮৩
বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে	...	৩২২
বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া	...	৫৩৭
বেঙ্গি	...	১০৩
বেঠিকানা তব আলাপ শব্দভেদী	...	২০
বোষ্টমী	...	২৩৪
ভাইবিত্তীয়	...	১৪
ভাইফোটা	...	২৬১
ভাবি বসে বসে গতজীবনের কথা	..	২২
ভূমিকা	...	৭৭
ভোজনবীর	...	১৭
ভোরে উঠেই পড়ে মনে	...	২২
মধুসূদারী (১-৪)	...	৫৮
বনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে	...	৭৭
মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো	...	১৫১
ময়ূরের দৃষ্টি	...	১২১
মশকমঙ্গলগীতিকা	...	৬২
মাহিত্য	...	৬১
মাহিবংশেতে এল অদ্ভুত জানী সে	...	৬১
মাল্যতরু	...	৩৪

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে ..	৭২
মিলের কাব্য ...	৬৭
মিষ্টাঙ্ঘিতা ...	৪২
যাত্রা ...	১০৪
যাত্রাপথ ...	৭৭
যাবই আমি যাবই ওগো ...	১৬৩-৬৪-৬৬
যায় যদি যাক সাগরতীরে ..	১৪৫
যে আমারে দিয়েছে ডাক ...	১৩৫
যে দেশে বায়ু না মানে ..	১৮২
যে মিষ্টায় সাজিয়ে দিলে ...	৪২
রক্ত ..	১১
রাজসভাতে ছিল জানী ...	২৭
রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন ..	৪৬২
রেলোটিভিটি ...	৫৩
লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পা জালা ...	৩৪
লিখি কিছু সাধ্য কী ...	৬৮
শান্ত যেই জন ..	১২০
শুনেছিহু নাকি মোটরের তেল ...	১০
শেষের রাত্রি ...	২৭৮
শ্রামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা ...	৫২
শ্রামা ...	৮২
সকলের শেষ ভাই ...	১৪
সভাপতির অভিভাষণ ..	৪৬৭
সভাপতির শেষ বক্তব্য ...	৫৭৭
সময়হারা ...	১০৬
সম্পাদকি ভাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে ...	২৫
সাহিত্য ...	৩৭৫
সাহিত্যভঙ্গ ...	৪৩৪
সাহিত্যধর্ম ...	৪০১
সাহিত্যবিচার ...	৪১৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৫

সাহিত্যরূপ	...	৪২২
সাহিত্যসমালোচনা	...	৫০৩
সাহিত্যসম্মিলন	...	৪৮২
সাহিত্যে নবত্ব	...	৪০৮
সাহিত্যের তাৎপর্য	...	৪৫০
স্বসীম চ-চক্র	...	৪৪
সৃষ্টি	...	৩২২
সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব	...	৪২
স্কুল-পালানে	...	৭২
স্ত্রীর পত্র	...	২৪৭
স্বতিরে আকার দিয়ে আঁকা	...	৭৭
হা-আ-আ-আই	...	১৭০
হাঁছোঃ, ভয় কী দেখাচ্ছ	...	১৭২
হায় হায় হায় দিন চলি যায়	...	৪৪
হালদারগোষ্ঠী	...	১২২
ছন্দয়ে মন্ত্রিল ডমরু গুরুগুরু	...	১৪৬
হে নবীনা, হে নবীনা	...	১৬৫
হে মহাছঃখ, হে রক্ত, হে ভয়ংকর	...	১৪৮
হৈমন্তী	...	২২০

উল্লেখযোগ্য সংশোধন । রবীন্দ্র রচনাবলী ২৩

পৃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১	পিরিচে পেরাকি	পিরিচে পেড়াকি
৩৮	৬	সে দন	সেদিন
৫৫	১৮	মোট	মোটা
৯২	২৪	চাঁদনীর	চাঁদিনীর
১০১	২০	রকে	রকে
১০৪	১৫	যাযাযা	যাযাযা
১০৮	১৬	ভাঙা	ভাঙা
১৭৪	১২	ওদিকে	ওদিক
২২৩	১	ছুটি	ছুটি
২৩০	১২	সম্মুখে	সম্মুখে
২৪৭	২৭	বালা	বাংলা
৩১৪	১৯	অস্তরের	অস্তরের
৩১৫	১২	কুচ্ছ	কুচ্ছ
৩২১	১৪	ব্যারামপ্রণালী	ব্যারামপ্রণালী
৩২৬	২৬	পায়লা-নথরে	পায়লা-নথরে
৩২৭	২৮	সীতাংশু	সিতাংশু
৩৩৯	১৯	বলশালী	ধনশালী
৪১৬	১৫	ন হমাতেই	মহিমাতেই
৪১৭	৮	দিয়ে	দিয়ে
৪৩৫	২	এঁকেই	এঁকেই
৪৪৭	৮	শোনাবামাত্র	শোনবামাত্র
৪৫০	১৪	থাকে	থেকে
৪৬৯	৬	নেই	নেই
৪৭৫	২৩	জানতে	জানাতে
৫০০	১২	অবসাদ	অবসাদ
৫৩০	১৯	রঙ্গ ।	বড়ো রঙ্গ ।

